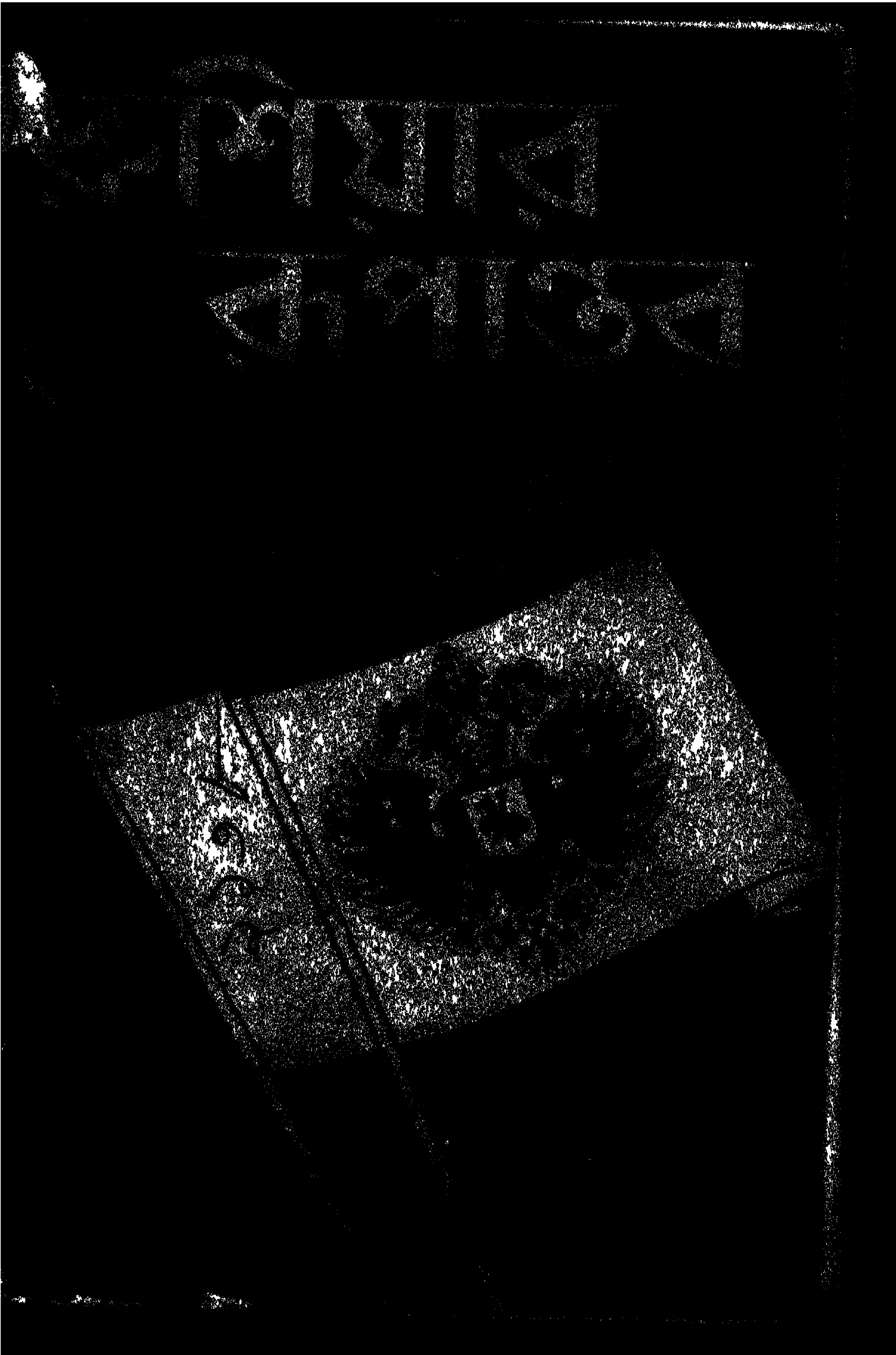


রুশিয়ার রূপান্তর

ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৬

দি সিটি বুক কোম্পানী
১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীকৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্পানী
১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দু টাকা চারি আনা

মুদ্রাকর
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গুহ
ডায়না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ
৬১, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভূমিকা

সংগতি-বোধ মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার সুরু হইতে সমাজে ও রাষ্ট্রে এই সংগতিবিধানের চেষ্টাই সে বরাবর করিয়া আসিয়াছে। বস্তুত, ইহাই মানুষের সমস্যা এবং এই সমস্যা ক্রমশ-প্রকাণ্ড উপন্যাসের মত নিত্য-নূতন ঘটনার আবর্ত রচনা করিয়া সুসমঞ্জস পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে উপন্যাসের শেষ আছে, মানুষের ইতিহাসের শেষ নাই। ইহা অবিরতই রচিত হইয়া চলিয়াছে। বিচিত্র ধারাবাহিকতাই ইহার প্রকৃতি ; কখনও অনাহত একটানা, আবার কখনও আঁকা-বাঁকা। এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই মানুষ নিজে উন্নত হয় এবং সংগে সংগে সমগ্র পরিবেশকে প্রভাবিত করিয়া ক্রম-বিবর্তনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে ; সভ্যতার এই জয়যাত্রার ইতিহাসে 'সোভিয়েট ইউনিয়ন' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ধনবৈষম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা যখন সমগ্র সমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্যর্থ হইয়া প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার অন্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছিল—রুশ-বিপ্লব তখন মুক্তি ও প্রগতির সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সমাজ তথা সভ্যতার

অগ্রগতি সূচিত করে। তাহার সমগ্র শক্তি ও উদ্যম, সত্যতার মূল উপাদান গণশক্তি (Mass), প্রতিভা (Brain) এবং অর্থের (Money) সমন্বয় সাধনে নিয়োজিত। এই সাধনার পথে তাহার অন্তরায়েরও অন্ত ছিলনা। সমগ্র পৃথিবীর ধনবাদী প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এই বিরাট পরীক্ষাকার্য বরবাদ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হয় নাই। অর্ধমৃত একটা বিশাল ভৌগোলিক সংস্থানে তড়িৎ প্রবাহের মত বৈপ্লবিক প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চারিত করিয়া বিপ্লবী রুশিয়া অনিবার্য দুর্দৈব হইতে ইতিহাসের গতি অব্যাহত রাখিয়াছে; যুগান্ত-সঞ্চিত কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকূপের মধ্যে শিক্ষা ও বিজ্ঞান-বুদ্ধির শাশ্বত আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া রুশিয়া ভাববাদী দর্শনের প্রগতি-বিরোধী প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে সমস্ত কিছুর মূল্য নির্ধারণ করিয়া রুশিয়া অতীতের অসার ঐতিহ্য যেমন অগ্রাহ্য করিয়াছে—তেমনি তাহার প্রত্যক্ষ অবদানকেও সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎকর্ষ বিধানে প্রয়োগ করিয়াছে। 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' গ্রহণ করিয়া এবং তাহা অপূর্ব সাফল্যের সহিত কার্যে পরিণত করিয়া জনসাধারণের আর্থিক নিরাপত্তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র ব্যাহত হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জনসাধারণের আর্থিক স্বাধীনতার বিধি-ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বর্ণসৌধ নির্মাণ করা সম্ভব

নয়। অবশ্য এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে রুশ-বিপ্লব এখনও সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। তবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সহায়তা করিবে, তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে যোগ্য নেতৃত্বের জন্য রুশবিপ্লব সফল হইয়াছিল এবং তাহার পরবর্তী সমস্ত বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আজ সেই নেতৃত্ব অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের ভিতর দিয়া যে জনপ্রিয়তা রুশিয়া অর্জন করিয়াছিল, সেই জন-প্রিয়তা আজ সে বহুল পরিমাণে হারাইয়াছে। কারণ যুদ্ধের ফলে যে গণতান্ত্রিক শক্তি ফাসিস্ত কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে—কার্যত দেখা যাইতেছে যে, রুশিয়া সেই শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইতেছে। আজিও সে 'ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রোলেটারিয়েট' এই পুরাতন মতবাদকে আশ্রয় করিয়া প্রকারান্তরে উক্ত গণতান্ত্রিক শক্তির একটি বিরাট অংশকে বিপ্লব-বিরোধী পক্ষে ঠেলিয়া দিতেছে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বিরাট হইয়া আরেকটি মহাযুদ্ধের আশংকা সৃষ্টি করিতেছে।

মার্কসবাদে গোঁড়ামির স্থান নাই। মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই ইহার উদ্দেশ্য; তাঁহাদিগকে মুদ্রার মত এক ছাঁচে ঢালাই করা সম্ভবও নয়—সংগতও নয়। ইহাতে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশ্য রুশিয়াতে ইহা কতদূর

বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়াছে—তাহা বলা শক্ত; তবে যুদ্ধ-পরবর্তী রুশিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে—তাহা কোথায় গিয়া কী পরিণতি লাভ করিবে কে জানে—?

আলোচ্য 'রুশিয়ার রূপান্তর' যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে লিখিত। যেমন যুদ্ধোত্তর অনেক ঘটনা ও তথ্যই উহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই; তৎসত্ত্বেও রুশ-বিপ্লবের কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কে সহজ সরল ভাষায় লিখিত একাধিক বাংলা পুস্তকের প্রয়োজন আছে।

রুশ-বিপ্লব যে পৃথিবীতে একটি নবযুগের সূচনা করিয়াছে—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে রুশিয়ার অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা যে নিঃসন্দেহরূপে উত্তম—তাহা বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের সমস্যাও বহুল পরিমাণে রুশিয়ারই অনুরূপ। কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে ভারতবর্ষকে বহুক্ষেত্রে রুশিয়ার পদাংক অনুসরণ করিতে হইবে। সুতরাং রুশিয়া সম্পর্কে যত বেশী পুস্তক এদেশে প্রকাশিত হয় ততই ভাল। বাংলার পাঠক-পাঠিকার নিকট 'রুশিয়ার রূপান্তর' এই দিক্ হইতে খুবই সমাদৃত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। দামও আজকালকার তুলনায় বেশী নয়।

সত্যেন সেন

সূচীপত্র

রাশিয়া

সোভিয়েট রাশিয়া দেখিয়া বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন, "বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্রজাতীয় মানুষ তার অধিবাসী।"

কথাটা খুবই সত্য। রাশিয়া প্রকৃতই এক বিরাট দেশ। উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তৃতি হইবে অন্যূন দুই হাজার মাইল, আর পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ছয় হাজার মাইল। জনসংখ্যাও বিপুল এবং নানা ধর্ম্ম ও নানা ভাষাভাষীর সমন্বয়ে রাশিয়ার অধিবাসী গঠিত। কিন্তু এই ভৌগোলিক বিস্তৃতি বা জনসংখ্যার বাহুল্যই রাশিয়ার একমাত্র গৌরব বা বৈশিষ্ট্য নহে। কারণ, ভৌগোলিক বিস্তৃতি বা জনসংখ্যার বাহুল্যই যদি গৌরবের বিষয় হয়, তাহা হইলে বিস্তৃতির জন্য আফ্রিকার গৌরব নিতান্ত কম নহে, আর জনবহুলতার জন্য ভারতবর্ষ ও চীন দেশের গৌরব হইত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, রাশিয়ার জনসংখ্যা যত বেশীই হউক্ না কেন, তাহা ভারতবর্ষ বা চীনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, সে বিষয়ে ভারতবর্ষ বা চীনদেশের দাবী অবশ্যই অগ্রগণ্য।

রাশিয়ার গৌরব তবে আজ কিসে? কিসের জন্য রাশিয়ার আজ দেশ-বিদেশে এত সুনাম ও এত প্রশংসা? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাহা হইলে রাশিয়া-দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধভাবে কেন একদিন বলিয়াছিলেন, "যা দেখছি আশ্চর্য্য ঠেকছে!"

আমরা ধীরে ধীরে, সংক্ষেপে, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রাশিয়া একদিন এমন অবস্থায়ই ছিল যে, জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক সেদিন বলিয়াছিলেন—"Russia is the last born child of European civilisation"—অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার শেষ সন্তান রাশিয়া। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সভ্যতার সন্তান হিসাবে রাশিয়ার নাম সর্ব্বনিম্নে।

কিন্তু সেই সভ্যতা-গর্ব্বী ঐতিহাসিক জীবিত থাকিলে দেখিতে পাইতেন যে, সভ্যতার সেই শেষ সন্তান রাশিয়াই আজ সভ্যতার প্রথম সন্তানরূপে বিশ্বের দরবারে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্য্যাদা একমুহূর্ত্তে অবারিত হয়েচে। চাষাভুষা সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেচে।"

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন। ১৯৩০ সালে রাশিয়া গমনের পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্যের

বহুস্থানেই তিনি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের সহিত রাশিয়ার সমালোচনাকালে স্বভাবতঃই তিনি তাঁহার উৎকৃষ্ট তুলনামূলক দৃষ্টির সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা আশা করা যায়। পাশ্চাত্ত্যের অঞ্জন-প্রলেপ তখনও তাঁহার চোখের কোণে লাগিয়া ছিল। কিন্তু রাশিয়ায় উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই প্রলেপ খসিয়া পড়িল, তিনি ঘোষণা করিলেন, "পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের যাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চল্‌চে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। ......বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুল্‌তে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।"

সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, আধুনিক রাশিয়া বিংশ শতাব্দীর এক পরম বিস্ময়। কিন্তু রাশিয়াকে এরূপ পরম বিস্ময়ে পরিণত করিল কাহারা?

সুখের ও সান্ত্বনার বিষয় এই যে, অজস্র রক্তপাত, ব্যথা-বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত ও দুঃসহ ক্ষয়-ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করিয়া যাহারা বিংশ শতাব্দীর পরম বিস্ময় এই রাশিয়াকে কল্পনার বাস্তব রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা কেহই অসাধারণ নহে—তাহারা সকলেই আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের দেহধারী সাধারণ মানুষ!

তাহাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল, সুখ-দুঃখের অনুভূতি ছিল। বাধা-নিষেধের শত সহস্র নিগড় তাহাদিগকেও আমাদেরই মত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে নিগড় অবহেলা বা

শিথিল করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস দেখিলেই তাহাদের স্কন্ধেও রাজশক্তি সিংহ-বিক্রমে লাফাইয়া পড়িত! তথাপি রাশিয়াতে এক শুভ মুহূর্ত্তে এক বিপুল পরিবর্ত্তনের সম্ভব হইল। কিন্তু রাশিয়াতে যাহা সম্ভব হইয়াছে, সেখানে আজ যাহা স্বাভাবিকতার কমনীয় সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত, তাহাই আজ আমাদের নিকট এক প্রকাণ্ড প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত প্রতীয়মান হইতেছে।

হাজার বছরের লক্ষ রকমের সংস্কার ও সংশয়ের দোলায় পরাধীনতার বিষাক্ত প্রতিকূল বাতাসে আমাদের দেহ মন অসাড় ও নির্জ্জীব; অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিপুল সম্ভাবনাময় আশা-আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবার শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের সঙ্কীর্ণ; সাহস আমাদের পঙ্গু ও অথর্ব্ব; সুতরাং রাশিয়াতে ধূমায়মান বহ্নি হইতে যে ভাবে একদিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইয়া সহসা দাবানলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের এই পরাধীন ভারতবর্ষে তাহা কোন-প্রকারেই সম্ভব হইল না!

কেবল তাহাই নহে। পরাধীন ভারতবর্ষে অধীনতার শৃঙ্খল কেবল তাহার রাজনৈতিক স্কন্ধেই কঠিন ভাবে চাপিয়া বসে নাই, ভারতের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি অংশই তাহার গুরুভারে নিপীড়িত। তাহার ফলে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ-বিদেশের সংবাদও তাহার নিকটে সহজ-লভ্য নহে। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কেবল পর্য্যটকদিগের বিবরণ

ব্যতীত রাশিয়া সম্পর্কে আর কোন সংবাদ আমাদের জানিবার উপায় ছিল না। তাহাও নির্ভুল, ভেজালশূন্য বা অপপ্রচারের কালিমা-মুক্ত সত্যরূপে আমাদের নিকট পৌঁছিত না। সুতরাং স্বভাবতঃই আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিত না।

তারপর কুক্ষণে বা সুক্ষণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল—সারা পৃথিবীতে, প্রধানতঃ ইউরোপে ধ্বংসের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইউরোপের সেই খাণ্ডববন-দাহনে সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অনেক সত্যকথা তখন সেই বিশৃঙ্খল আবরণ ভেদ করিয়া সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল।

বিশেষতঃ রাশিয়া যখন অন্যতম মিত্রশক্তি রূপে পরিগণিত, তখন তাহার মর্ম্মকথা এবং অনেক গোপন সংবাদ পরাধীন ভারতের পক্ষেও আর নিষিদ্ধ রহিল না—অনুকূল বায়ু-সংস্পর্শে রাশিয়ার সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং রাশিয়া সম্পর্কে সমস্ত অনুমান, সমস্ত সন্দেহ, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত ধারণা, সত্য-মিথ্যার রাসায়নিক মিশ্রণ হইতে আজ বিরুদ্ধবাদীর সমস্ত প্রচার-কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিয়া রাশিয়া আজ জ্বলন্ত ভাস্করের ন্যায় আমাদের সম্মুখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমরাও আজ ভাবিতে সুরু করিয়াছি।

আজ শুধু ভারতবর্ষকেই নহে, সমগ্র পৃথিবীকেই রাশিয়া ভাবুক করিয়া তুলিয়াছে। যে সমাজ-ব্যবস্থা ও আদর্শ

যাহা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেই সমাজ-ব্যবস্থা ও আদর্শ, এবং যাহারা সেই অসম্ভব কল্পনাকেও বাস্তবে পরিণত করিয়া পৃথিবীতে একটি নূতন সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে আমাদের একটা সম্যক্ ধারণা থাকা ক্রমশঃই অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার কারণ অনেক। ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য লুব্ধচিত্তে ভোগের পূজারী হওয়া, কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বৈরাগ্যের উপাসক হওয়া, সামাজিক জীবনে এই উভয় পন্থাই সমালোচকের তীব্র কটাক্ষ-বর্জ্জিত নহে। সামাজিক জীবনে একটা বড় কথা,—আমাদের বাসভূমিকেই যদি স্বর্গের সুখ-শান্তির ছোঁয়াচে, এক অভিনব আদর্শে কথঞ্চিৎ রম্য নিকেতনে পরিণত করা যায়, তবে তাহা কে না আকাঙ্ক্ষা করিবে? সুতরাং, যে ব্যবস্থা পৃথিবীর বিশাল স্থলভাগের এক-ষষ্টাংশ পরিমিত স্থানে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সারা ইউরোপও যখন সেই পথ অনুসরণ করিতেছে, তখন সে ব্যবস্থাকে বৃহত্তর জগতে স্থায়িভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে আমাদের দায়িত্বও নিতান্ত কম নহে।

কারণ, একদিকে যেরূপ রাশিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ স্থানে একটি শোষণহীন সমাজের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ আমেরিকা তাহার বিপরীত আদর্শ

ও ব্যবস্থা লইয়া, এই যুদ্ধের সুযোগে অতলান্ত ও প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, ইউরোপ ও এশিয়ায়ও আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং পরস্পর-বিরোধী আদর্শ-সংঘাতে অপর এক যুদ্ধের অনিবার্য্যতায় কোন্ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহাও চিন্তা করা সঙ্গত।

সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেখিয়াছি। যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে এক-একটা যুদ্ধ আসিয়া পৃথিবীর শুধু মানচিত্রই পরিবর্ত্তন করে নাই,—পুরাতন ব্যবস্থা, পুরাতন ধ্যান-ধারণা, পুরাতন আদর্শ, সভ্যতার প্রচলিত মানদণ্ড, সব-কিছুর ভিতরেই বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। বিপ্লবের এই জয়যাত্রা কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, নিরঙ্কুশ গতিতে নিজেই নিজের পথ করিয়া লইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইতিহাসেব এইরূপ যাবতীয় দৃষ্টান্তকে ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ কবিয়া দিয়া সমস্ত জগদ্ব্যাপী এক বিরাট বিপ্লবের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

এতদিন পর্য্যন্ত সেই সিংহদ্বারেব দুই সজাগ প্রহরী ছিল জার্ম্মানীর নাৎসীবাদ ও ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদ। কোন শক্তিরই সাধ্য ছিলনা যে, এই দুই সজাগ হিংস্র প্রহরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদ করিয়া বিপ্লবের ইসারা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু এই যুদ্ধ ইহাদের উভয়কেই কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। এবং বিশ্ব-হৃদয়ের অন্তস্তলে যে আন্তরিক কামনা ও গোপন আকাঙ্ক্ষা লুকায়িত ছিল, বিপ্লবের সেই বহ্নি-স্রোত আজ লাল ফৌজের বর্শাফলকের

আঘাতে সহস্রধারা হইয়া দুর্ব্বার স্রোতে ইউরোপের ধনিক-সমাজকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তবে ইহাও যেমন সত্য, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদের কবরের উপরে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিজয়-নৃত্যও ততোধিক সত্য। তবে অতীত ও বর্ত্তমানে পার্থক্য এই যে, অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাধা দিবার কেহ ছিল না; কিন্তু আজ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে বাধা দিবার জন্য "ইউরোপীয় সভ্যতার কনিষ্ঠ সন্তান" (The last-born child of European civilization) রাশিয়া, এসিয়া ও ইউরোপে তাহার বিশাল দুই বাহু বিস্তার করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। সুতরাং মুক্তিকামী ভারতবর্ষের আজ ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে, কাহার আদর্শকে সে বরণ করিয়া লইবে। সে তাহার প্রতিবেশী রাশিয়ার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এক নূতন আদর্শে ও নূতন প্রেরণায় নূতনের সন্ধান করিবে? না, ভোগ ও বিলাসের লীলাভূমি মদগর্ব্বী মার্কিন আদর্শকেই তাহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া মানিয়া লইবে?

ইহাদের মধ্যে একের আদর্শ হইতেছে, পৃথিবীতে সাম্যের তুলাদণ্ডে জাগতিক স্বার্থকে মিলাইয়া দেওয়া; আর অপরের আদর্শ হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে জগতের বুকে জগদ্দল পাষাণের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা।

রাশিয়ার আদর্শ ও আমেরিকার আদর্শকে এই ভাবে তুলনা

করিতে গিয়া আজ কবি রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি কথা মনে পড়িতেছে। ১৯৩০ সালে তিনি তাঁহার "রাশিয়ার চিঠি"তে রাশিয়া সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—"আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করচে।"

রবীন্দ্রনাথ ইহা মর্শ্মে মর্শ্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; সুতরাং হর্ষ-মুগ্ধ চিত্তে তিনি সেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, "রাশিয়ায় এসেচি—না এলে এজন্মের তীর্থ-দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো।"

ভারতবর্ষ চিরদিনই আদর্শের পূজারী। আদর্শের জন্য ভারতের সন্তান, রাজার দুলাল হইয়াও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিতে পারে ; সুতরাং রাশিয়ার আদর্শ—জাগতিক সাম্যবাদ, ও আমেরিকার আদর্শ—স্বাজাতিক স্বার্থবাদ,—এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকে যে ভারত শ্লাঘ্য ও পূজনীয় জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিবে, তাহা স্বতঃই অনুমান করা যাইতে পারে।

রাশিয়া সম্পর্কিত পুস্তকে এরূপ আলোচনা হয়তো অনেকে অনাবশ্যক ও অবান্তর বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অতীতের জগৎ, আর বর্ত্তমান জগৎ এই উভয়ের মধ্যে এখন পার্থক্য অনেক।

অতীতের জগৎ তাহার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান জগৎ—তাহার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোন অংশেই কেবল ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে। বিবিধ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া দিয়া দূরকেও নিকটে টানিয়া আনিয়াছে—ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ পরস্পর সংস্পর্শহীন বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে এক মহা-জাতিত্বের সম্ভাবনাকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। কাজেই কেবল কল্পনা-বিলাসী কিংবা স্বপ্নচারীর স্থান এখন আর এই নূতন জগতে নাই; কিংবা স্ব-স্ব জাতীয় আদর্শের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া উক্ত মহা-জাগতিক আদর্শকে ক্ষুন্ন করিয়া চলিবার দিনও গেছে।

এই সম্ভাব্য "মহামানবের সাগর-তীরে" দাঁড়াইয়াই সোভিয়েট রাশিয়া আজ—জাতীয়তাবাদ-জর্জ্জরিত বর্ত্তমান পৃথিবীকে সেই মহামানবের মহা-মিলন-তীর্থে পরিণত করিবার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে তাহার উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে।

মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় ধনিক-শ্রেণীর সহযোগে রাশিয়ার গৌরবোজ্জ্বল রক্তমূর্ত্তিকে যত মসীলিপ্ত বা ভয়ঙ্কর রূপেই চিত্রিত করুক না কেন, ইতিহাসের কঠোর সত্য আজ বাস্তব রূপেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে! ভারত আজ যথার্থ ই ভাবিতে সুরু করিয়াছে,—রাশিয়া কি ছিল, কি হইয়াছে! ভারতবর্ষই বা কি হইয়াছে, এবং হইতে পারেই বা কি?

রাশিয়ার ইতিহাস অধ্যয়ন এবং তাহার অনুসৃত নীতির অনুধাবন, ভারতের অন্ধ ললাটে অপর এক সূক্ষ্ম নয়ন বিকশিত করিয়া দিয়াছে। সে তাহার স্থূল নয়নে এতদিন কেবলই হতাশভাবে দেখিয়া আসিতেছিল,—শোষণের রক্তজিহ্বা, শাসনের রক্তচক্ষু, আর মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও অভাবের হিংস্র আর্তনাদ ও মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস !

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষতঃ রণক্ষেত্রে অন্যতম মিত্রশক্তিরূপে রাশিয়ার অবতীর্ণ হওয়ার পর মুহূর্তেই,—রাশিয়ার প্রচার-কৌশলে, তাহার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাম্যবাদ বর্ষার প্লাবনের ন্যায় আমাদের ক্ষুদ্র কুটীর-দুয়ারেও আঘাত করিয়া গেল ! সেই আঘাতে দুয়ারের সম্মুখে পুঞ্জীভূত মিথ্যা ও অপপ্রচার নিমেষে কোথায় ভাসিয়া গেল, আর আমাদের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল কোন্ এক মহিমোজ্জ্বল স্বর্গের সাম্য-মন্দির !

সাম্যমন্ত্রের পূজারী রাশিয়ার সাম্য-মন্দির আজ আমাদের নয়ন-সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আদর্শ আমাদের মিলিয়া গিয়াছে,—এখন বাকি শুধু আদর্শের অনুসরণ। এখন আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীকে শুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভারতের ভাবী ইতিহাসের ভূমিকা রচনা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আণবিক শক্তিরও (atomic energy) উল্লেখ প্রয়োজন। ইহা যেন মানব-সভ্যতার এক চূড়ান্ত নৃশংস মূর্তি !

দস্যু রত্নাকর একদিন শিক্ষা ও সাধনার বলে মহামুনি বাল্মীকি রূপে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সুসভ্য মানব-মস্তিষ্কোদ্ভূত বিজ্ঞান-সাধনা-লব্ধ আণবিক শক্তি আজ বিশ্বহিতের মধুর-মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া কালান্তক সংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এখন কে ইহার একমাত্র পরিবেষক হইবে কাড়াকাড়ি পড়িয়াছে তাহাই লইয়া।

কিন্তু হত্যাকারীরও নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক হয়। সুতরাং আণবিক শক্তির Sole Agency বা একচেটিয়া অধিকার লইয়া যে বিষম দ্বন্দ্বের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে, তাহাতেও বিশ্বহিত বা কল্যাণময় গঠনাত্মক নীতি প্রভৃতি গালভরা মুখরোচক সংজ্ঞার আড়ালে কৈফিয়ৎ শোনা যাইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর স্বস্তির কাজে আণবিক শক্তির গঠনাত্মক দিক্‌টা যে কতদূর সার্থক হইবে, সেই সন্দেহজনক ফলাফল শুধু ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

এই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় কৈফিয়ৎ ও আণবিক শক্তির জন্য দ্বন্দ্বের প্রয়াস, সকলেই অসহায় ভাবে গভীর বিরক্তি ও শঙ্কার সহিত লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু ইহারও প্রতিকার যদি কখনো হয়, তবে তাহারও একমাত্র ভরসা-স্থল রাশিয়া বা সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার লাল ফৌজ যেমন অশান্তির অগ্রদূত নাৎসীবাদকে ধ্বংস করিয়া ইউরোপের ত্রাণ

ধনতান্ত্রিকের অনুর্ব্বর ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল গণতন্ত্রের অঙ্কুর জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রয়োজন হইলে,—আণবিক শক্তি-চালিত আণবিক বোমার (Atom bomb) নিবারক হিসাবে কোন প্রতিষেধকও তাহার দ্বারাই আবিষ্কৃত হইবে— এইটুকু ভরসাই আজ অসহায় দুর্ব্বলদিগের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, যে ভাবেই হউক না কেন, যে-দেশের বাস্তব আদর্শ, যে-দেশের চিন্তা-ভাবনা, যে-দেশের বিবিধ প্রশ্ন ও সমস্যা আজ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,—যে-দেশকে এড়াইয়া চলিবার শক্তি আজ আর কাহারও নাই—এবং যে-দেশের যোগদানে পৃথিবীর যে-কোন শক্তি বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করিবার অধিকারী বিবেচিত হয়,—সে-দেশেরই নাম 'রাশিয়া' এবং সে দেশেরই সমষ্টিভূত গণশক্তি—'সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট'।

রাশিয়ার অধিবাসী

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "বৃহৎ দেশ এই রাশিয়া, আর বিচিত্র জাতীয় মানুষ তার অধিবাসী।"

কথাটা যে কত সত্য, একটু ভাবিলেই তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ইউরোপ ও এসিয়ার এক বিপুল অংশ ব্যাপিয়া রাশিয়া। সুতরাং রাশিয়ার এক অংশের নাম 'ইউরোপিয়ান্ রাশিয়া,' আর অপর অংশের নাম 'এসিয়াটিক রাশিয়া'।

সমগ্র রাশিয়ার আয়তন ৮৩,৫০,০০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ। সুতরাং সমগ্র রাশিয়া যে কত বৃহৎ, ইহা হইতেই তাহার কিছু ধারণা পাওয়া যাইতে পারে।

রাশিয়ার লোকসংখ্যা ২০ কোটি ; তাহাও বর্ত্তমানে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকসংখ্যা বেশী হইলেও সকলেই যদি একই জাতীয় হয়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের আশঙ্কা কম থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় রাশিয়ারও

বৈচিত্র্য এই যে, অগণিত জাতি সেই দেশের অধিবাসী। প্রায় ১৯০টি বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে রাশিয়ার বিরাট জনসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভাষা এবং ধর্ম্মও তাহাদের কত বিচিত্র। চল্লিশ রকমের ধর্ম্ম আর দেড়শত রকমের কথ্যভাষা সে দেশে প্রচলিত। সুতরাং, এত বৈচিত্র্য ও এত পার্থক্য যে দেশের সম্পদ, সে দেশের অধিবাসীরা যে জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্ম্মগত বিভিন্নতার জন্য স্বভাবতঃই একে অন্য হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ছিলও ঠিক সেই ভাবেই। এত বৈষম্যের জন্য, তদুপরি শাসক-শ্রেণীর প্ররোচনায় ও উস্কানিতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ সর্ব্বদাই সজীব হইয়া থাকিত। কাজেই কেহ কাহারও জন্য ভাবিত না, কেহ কাহারও মঙ্গল চিন্তা করিতে পারিত না। বরং এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপর শ্রেণীকে, এক জাতির বিরুদ্ধে অপর জাতিকে উত্তেজিত করিয়া একটা ক্রম-বর্দ্ধমান ঈর্ষ্যাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল শাসকবর্গের একমাত্র প্রচেষ্টা।

এই ভাবেই ছিল দীর্ঘকাল। কিন্তু সহসা একদিন যেন যাদুকরের যাদুমন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও নানা ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণ তাহাদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সারা জগৎ সন্ত্রস্ত হইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল, রাশিয়ার অধিবাসীদের এই পরিবর্ত্তন, এই একতার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ জনসাধারণের উপর "জার" উপাধিধারী রুশ সম্রাটের অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন।

অধিবাসীরা বুঝিল কোথায়ও তাহাদের সামঞ্জস্য নাই বটে, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা, জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা সবই বিভিন্ন, কিন্তু অত্যাচারের বেদীমূলে তাহারা একই যূপকাষ্ঠে সমান ভাবে আবদ্ধ, ভাগ্য তাহাদের সমান।

তাহারা দেখিল, আঘাতের তরঙ্গ যখন তাহাদিগকে আক্রান্ত করিতে থাকে, তখন তাহা সকলের বুকেই সমান প্রচণ্ড ভাবে আঘাত হানে,—জাতি, ধর্ম্ম বা ভাষাগত বৈচিত্র্যের জন্য কাহাকেও কোন ইতর বিশেষ করে না। সুতরাং দুঃখ-কষ্টের প্রতিকূল স্রোতে তাহাদিগকে একই ভাবে, পাশাপাশি থাকিয়া সাঁতার কাটিতে হয়—ব্যথা-বেদনার কাতর আর্ত্তনাদ তাহাদের কণ্ঠে সমতানে ধ্বনিত হয়।

এইভাবে শাসকবর্গের রুদ্র অত্যাচার রাশিয়ার বিচিত্র অধিবাসীদের চোখের সম্মুখে সামঞ্জস্যের এক নূতন ক্ষেত্র মেলিয়া ধরিল—তাহারা একই সঙ্গে মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

একটা চিরন্তন সত্য তাহাদের কানে আজ এক নূতন ঝঙ্কার সৃষ্টি করিল। তাহারা আজ বুঝিল,—মানুষের দেহের রং বিভিন্ন হইতে পারে, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলিতে পারে

এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মানুযায়ী বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানও ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে সাম্যের অভাব নাই; কারণ দৈব চাহিদাগুলি সকলেরই অভিন্ন—খাওয়া-পরা, বাসস্থান, তাহাদের সকলেরই চাই। কিন্তু শাসক ও ধনিক-শ্রেণী এবিষয়ে তাহাদের ভাগ্য-পথের অন্তরায়।

তাহাদের মনে হইল, শুধু খাওয়া-পরা, বাসস্থান নয়, তাহাদের সর্ব্ববিধ অভাবের মূলেই রহিয়াছে শাসক ও ধনিক-শ্রেণী—যাবতীয় ব্যথা-বেদনা, অত্যাচারের মূলেও তাহারাই।

এই চৈতন্য যেদিন তাহাদের মস্তিকে আত্মপ্রকাশ করিল, সেদিন মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহাদের মেরুদণ্ড ঋজু ও লৌহ-কঠিন হইয়া উঠিল, তাহারা সমবেতভাবে তাহাদের দাবী জানাইল—অতি সাধারণ দাবী—"আমাদের খাওয়া-পরা ও বাসস্থান আমরা চাই।"

আজ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই অর্থনৈতিক দাবীর উপরেই লেনিন, ষ্ট্যালিন প্রভৃতি বলশেভিক নেতৃবৃন্দ সমস্ত শোষিত ও উৎপীড়িত রুশদিগকে একতাবদ্ধ করিয়াছিলেন।

যদিও এসিয়ার নানা জাতি ইহার পূর্ব্বাংশে বাস করে, তথাপি রাশিয়ার সভ্যতা প্রধানতঃ ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন। কিন্তু ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন এবং কার্য্যতঃ বহু অংশে খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, রাশিয়া ইউরোপের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালি প্রভৃতি দেশের অপেক্ষা শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বহু

পশ্চাতে ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্দ্ধসভ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত।

রাজশক্তি অনুকূল থাকিলে একটা অর্দ্ধসভ্য ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত জাতির পক্ষেও শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নত সোপানে আরোহণ করা দীর্ঘকাল অসম্ভব থাকেনা; কিন্তু রাশিয়ার ভাগ্য সে দিকেও সুপ্রসন্ন ছিল না। প্রবল প্রতাপান্বিত 'জার্' বা রাশিয়ার সম্রাট্ই ছিলেন রাশিয়াতে একমাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা। পশ্চিম-ইউরোপেও রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার বহু ইতিহাস আছে বটে, তথাপি পশ্চিম-ইউরোপ ও রাশিয়ার অবস্থা একরূপ ছিল না।

পশ্চিম-ইউরোপে রাজশক্তি ও ধর্ম্মগুরু মহামান্য পোপের শক্তি প্রায়ই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সঙ্ঘর্ষে অবতীর্ণ হইত। সুতরাং রাজশক্তি স্বেচ্ছাচারী হইলেও পোপের শক্তি তাহাকে নিরঙ্কুশ গতিতে বিচরণ করিতে দেয় নাই। কিন্তু রাশিয়ার রাজশক্তির সমর্থনকারী ছিল রাশিয়ার ধর্ম্ম-জগৎ। কাজেই রাশিয়ার জনসাধারণ রাজশক্তি ও ধর্ম্ম-জগতের মূর্ত্ত বিগ্রহ পুরোহিত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যুগপৎ একই সময়ে দলিত-মথিত ও নিষ্পেষিত হইতেছিল।

রাশিয়ার জন-সাধারণের দুর্ভাগ্য কেবল ইহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শাসনের নামে রাজশক্তি তাহাদের বুকের উপর দিয়া অত্যাচারের বিজয়-রথ অব্যাহত গতিতে প্রচণ্ড ভাবে চালাইয়া যাইতেছিল; আর ধর্ম্মের নামে পুরোহিত-সম্প্রদায়

তাহা সমর্থন করিয়া যাইতেছিলেন। তদুপরি, রাশিয়ার ধনিক-সম্প্রদায়ও জনসাধারণের দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছিলেন—নিঃস্ব, অসহায় অধিবাসীদিগকে তাঁহারা ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করিয়া ক্রমশঃই মোটা লাভের অঙ্কে ফাঁপিয়া উঠিতেছিলেন। ইউরোপেও এই ঘৃণ্য-ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল বটে, কিন্তু কতিপয় মহামনীষী ব্যক্তিদিগের উদার আন্দোলনে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে এই পাপ-ব্যবসায় চিরতরে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল।

সুসভ্য ইউরোপ যাহা সহজেই ঝাড়িয়া ফেলিল, অর্দ্ধসভ্য রাশিয়া তাহা আরও দীর্ঘকাল বুকে আঁকড়াইয়া রাখিল—রাশিয়ার Serfdom বা কৃষকের দাসত্ব রাশিয়ার বুকে আরও দীর্ঘকাল শিকড় গাড়িয়া রহিল। সুতরাং রাশিয়ার অধিবাসীবৃন্দ এই ত্রিবিধ শত্রু—রাজশক্তি, পুরোহিত-সম্প্রদায় ও ধনিক-শ্রেণী,—ইহাদের মাঝখানে পড়িয়া, অন্ধকারে—চির-অন্ধকারে রহিয়া গেল। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রশ্ন, আহার-বাসস্থানের প্রশ্ন, সবল স্বাস্থ্যের প্রশ্ন, সব-কিছুই চিরদিনের জন্য কোন্ অতলে অজ্ঞাতই রহিয়া গেল!

প্যারিসে বা অক্সফোর্ডে লোকশিক্ষার জন্য যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রাশিয়ায় সেই জাতীয় কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই ছিল না। অবশ্য, রাশিয়ার সুবিশাল ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং তাহার জলবায়ুর অবস্থাও

কতকাংশে ইহার জন্য দায়ী ছিল ; কিন্তু তথাপি রাজশক্তির অবহেলাই ছিল তাহার প্রধান কারণ।

'অবহেলা' হইলেও তাহা যে স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কারণ, রাজশক্তি বুঝিয়া লইয়াছিল যে, রাশিয়ার জনসাধারণ যদি শিক্ষা-বর্জিত, দারিদ্র্য-জর্জরিত, ব্যাধি-পীড়িত জীবন যাপনে বাধ্য হয়, তবেই তাহাদিগকে ইতর জীব-জন্তুর ন্যায় স্বেচ্ছাচারিতার বন্যায় আবদ্ধ রাখিয়া কঠিন হস্তে শাসন ও শোষণ করা যাইতে পারে।

কেবল তাহাই নহে। রাজশক্তি জানিত, অধিবাসীরা যদি অশিক্ষার নিরন্ধ্র অন্ধকার কূপমধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তবেই কেবল তাহাদের ধর্মগত, জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্যের সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন করিয়া রাখা সম্ভবপর হইতে পারে। ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যে প্রবল-প্রতাপান্বিত জারের সিংহাসন ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সুকঠিন হইয়া পড়ে! সুতরাং তিনি তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের বহু ভাষাভাষী ও বহু জাতীয় অধিবাসীদের নানা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সুযোগ সর্বদাই গ্রহণ করিতেন। কাজেই তাহাদের মধ্যে একতাই বা থাকিবে কিরূপে? আর অর্দ্ধসভ্য অধিবাসিগণ সভ্যতার উন্নত সোপানেই বা আরূঢ় হইবে কিরূপে?

দেশের এই আবহাওয়া এবং সমাজের এই পটভূমিকা আপাত-দৃষ্টিতে স্বার্থান্ধ শাসক ও শোষক-শ্রেণীর নিকট অনুকূল

মনে হইলেও যে-কোন মুহূর্তে ভ্রমাত্মক প্রতীয়মান হইতে পারে। বিশেষতঃ একই সময়ে যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি শিক্ষা, সভ্যতা ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আংশিক প্রবর্তনে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন রাশিয়াতে পূর্বোক্ত জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কোন সুফল না ফলিয়া কেবল ঘৃণা ও বিদ্বেষই উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক।

অধিকন্তু ফরাসী-বিপ্লবের কথা জনসাধারণের মনে তখনও সজীব হইয়াই ছিল। সেই বিপ্লবের আদর্শ শুধু ফ্রান্সের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সেই আদর্শ নেপোলিয়নের সামরিক অভিযানের মারফৎ ইউরোপের গোটা রাজতন্ত্রকেই প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল।

ভৌগোলিক দূরত্ব, যাতায়াতের অব্যবস্থা এবং শেষ পর্য্যন্ত নেপোলিয়নের বিপর্য্যয় রাশিয়ার রাজতন্ত্রকে সে আঘাত হইতে রক্ষা করিলেও, রাশিয়ার জনসাধারণের হৃদয়ে তাহার প্রভাব অজ্ঞাতসারে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই বাহ্যিক রূপ আমরা 'নিহিলিষ্ট আন্দোলন' নামে রাশিয়ার এক সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে দেখিতে পাই।

নিহিলিষ্ট আন্দোলন দমন করিবার জন্য রাশিয়ার 'জার্'ও কঠোর পীড়ন-নীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। তদুপরি জাপানের সহিত যুদ্ধে জারের পরাজয়ে রাশিয়ার জন-সাধারণের এরূপ এক শোচনীয় অবস্থা হইল যে, তাহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা সমবেত ভাবে সম্রাটের

দরবারে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী নিবেদন করিতে চলিল।

তাহাদের দাবী ছিল অতি সাধারণ। অর্থনৈতিক দাবী—রুটি বা উদরান্নের সংস্থান। কিন্তু রুটির বদলে সম্রাট্ তাহাদিগকে জ্বলন্ত সীসকখণ্ড উপহার দিলেন—তপ্ত গুলিতে বিদ্ধ হইয়া অগণিত নিরন্ন প্রজা 'উইন্টার প্যালেসের' সম্মুখে লুটাইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গে সারাদেশ উত্তপ্ত

সে বিপ্লব তাহাদের সার্থক হয় নাই বটে, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সেই তাহাদের হাতে খড়ি মাত্র। রাশিয়ার জনসাধারণের সেদিনের সেই হাতে খড়ি, সেদিনের সেই প্রচেষ্টা, ব্যর্থ প্রতীয়মান হইলেও বিপ্লবের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা ও মঙ্গল-ঘট স্থাপন হইয়াছিল সেদিনই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিফলতায় যাহার সূচনা, সফলতাই তাহার পরিণতি, জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাশিয়ার ইতিহাসেও তাহাই সত্য হইয়া উঠিল। সেদিনের সেই বিফলতা, সফল হইল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে।

এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আকৃতিই কেবল পরিবর্ত্তিত হয় নাই,—বিপ্লবের মহানেতা মহামতি লেনিনের নির্দ্দেশে 'রাশিয়া'র বদলে তাহার এই নব-গঠিত রাষ্ট্রের নাম পর্য্যন্ত ভিন্ন হইল,—তাহার নামকরণ হইল, "ইউনিয়ন অব সোস্যালিষ্ট সোভিয়েট

রিপাব্লিকস্" (Union of Socialist Soviet Republics) অথবা সংক্ষেপে শুধু "সোভিয়েট্ রিপাব্লিকস্" বা "ইউ. এস্. এস্. আর" (U. S. S. R.)। চলতি কথায় ইহাকে "সোভিয়েট ইউনিয়ন"ও বলা হয়।

এই সোভিয়েট ইউনিয়ন ছয়টি 'রিপাব্লিক' (Republic) বা গণতন্ত্রের সমবায়।

(১) শ্বেত রাশিয়ান সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক। রাজধানী—মিনস্ক্।

(২) ট্রান্স-ককেশিয়ান্ সোস্যালিষ্ট ফেডারেল সোভিয়েট রিপাব্লিক। রাজধানী—টিফ্লিস্।

(৩) রাশিয়ান সোস্যালিষ্ট ফেডারেল রিপাব্লিক এবং তদন্তর্গত স্বতন্ত্র (স্বয়ং-শাসিত) কতকগুলি রিপাব্লিক প্রদেশ।

(৪) তুর্কমেনিস্থান সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক। রাজধানী—পোলোরাটাস্ক।

(৫) উজবেক সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক। রাজধানী—সমরখন্দ।

(৬) ইউক্রেন সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক। রাজধানী—খারকভ্।

প্রথমটি ৫টি প্রদেশ লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়টি ৫টি রিপাব্লিক লইয়া গঠিত। তৃতীয়টি ৪৮টি প্রদেশ, ১৬টি স্বতন্ত্র প্রদেশ এবং ১৭টি রিপাব্লিক লইয়া গঠিত। চতুর্থটি একটি প্রদেশ মাত্র। পঞ্চমটি ৫টি প্রদেশ ও একটি স্বতন্ত্র রিপাব্লিক লইয়া গঠিত। ষষ্ঠটি ৯টি প্রদেশ ও একটি স্বতন্ত্র রিপাব্লিকএর

সমষ্টি। বর্ত্তমান রাশিয়াতে স্বায়ত্তশাসন যে কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে, এই U. S. S. R. এর গঠন-প্রণালীই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

প্রথমে চারিটি রিপাব্লিক লইয়া ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছিল।* তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় রিপাব্লিকরূপে রাশিয়ান রিপাব্লিক (৩নং) এবং ইউক্রেন রিপাব্লিকের নাম (৬নং) উল্লেখ করা যাইতে পারে। তারপর নাম করা যাইতে পারে শ্বেত রাশিয়ান রিপাব্লিক (১নং), এবং সর্ব্বশেষে উল্লেখযোগ্য ট্রান্স-ককেশিয়ান্ রিপাব্লিক (২নং)।

এই শেষোক্ত ট্রান্স-ককেশিয়ান্ রিপাব্লিক বর্ত্তমানে তিনটি রিপাব্লিকে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদের নাম—জর্জ্জিয়া, আর্ম্মেনিয়া এবং আজারবাইজান। মধ্য-এশিয়ায় তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেক রিপাব্লিকের নিকটে আরও তিনটি রিপাব্লিক আছে। যথা—তাজিক, কাজাক এবং খিরগিজ রিপাব্লিক। এই পাঁচটি রিপাব্লিকই এই অঞ্চলের পাঁচটি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীদের জন্য গঠিত। বিগত ১৯৪০ সালে রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে আরও পাঁচটি রিপাব্লিক গঠিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথা—কারেলো-ফিনিস, এস্তোনিয়ান, ল্যাটভিয়ান, লিথুয়ানিয়ান এবং মোল্ডাভিয়ান রিপাব্লিক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিশাল রাজ্যে অধিবাসীর সংখ্যা যেমন অগণিত তাহাদের ধর্ম্মও তেমনই অসংখ্য। কাজেই

* U. S. S. R.—Her Life and Her People (p. 64)—Maurice Dobb.

বর্ত্তমান নূতন রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই 'রাশিয়া' বা 'সোভিয়েট ইউনিয়ন' বলিতে আজ জগতের এক মহাজাতিকে বুঝাইয়া থাকে। অত্যাচারে ও শোষণে জর্জ্জরিত হওয়ায়, এই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, এবং বারুদখানায় প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় একদিন তাহাই লেলিহান হইয়া উঠিয়াছিল।

যে সকল বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে এই বিরাট জাতি পৃথিবীর বুকে এক মহা-বিস্ময় রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) গ্রেট রাশিয়ান্। ইহারা শ্বেত সাগর হইতে সকড় হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী।

(২) লিটল্ রাশিয়ান্।—ইহারা দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশবাসী।

(৩) কসাক্।—ইহারা পূর্ব্ব প্রদেশবাসী এবং ডন্ ও কিউবান্, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

(৪) হোয়াইট্ রাশিয়ান। ইহারা মধ্য-রাশিয়ার পশ্চিম-প্রান্তবাসী এক মিশ্রজাতি।

(৫) ফিনিশ্ জাতিসমূহ। উগ্রিয়ান্, পারমিয়াক, বুলগেরিয়ান্ এবং ফিন্। ফিন্‌গণ বর্ত্তমানে পশ্চিমবাসী, উত্তরবাসী, ভল্‌গা তীরবাসী, পারমিয়াক ও উগ্রিয়ান, পাঁচভাগে বিভক্ত।

(৬) তুর্কো-তাতার। ইহারা তিন সম্প্রদায়ভুক্ত। যথা—কাজান-তাতার, অষ্ট্রাকান-তাতার ও ক্রিমিয়ান-তাতার।

(৭) মুর্দ্ভিন্। ইহারা ভল্‌গার দক্ষিণ তীরবাসী।

(৮) মেসচেরিয়াক্। ইহারা উফা ও পার্ম প্রদেশে বাস্কিরদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছে।

(৯) বৈশ্‌টারায়স্ ও খিরগিজ। যোগল কালমুক্‌স, সেমিটিক জাতি ও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইহুদীদিগের এক সম্প্রদায়ের নাম কারাইট। ইহাদের আচার-ব্যবহার, পূজা-পদ্ধতি সমস্তই ভিন্ন প্রকার। ইহাদের অধিকাংশই কৃষক। ইহা ছাড়া, এই বিস্তৃত রাজ্যে বহু জার্মান, রোমানিয়ান, লিথুনিয়ান, গ্রীক, ফরাসী এবং পোলজাতি রুশদের সহিত মিলিত হইয়া এক জাতিরূপে বাস করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত রাশিয়াতে আরও অনেক জাতি বাস করিতেছে। আমরা যে কসাক্ জাতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এক বিরাট-ইউক্রেনিয়ান্ জাতির একটা অংশ মাত্র। সমগ্র ইউক্রেনিয়ান্ জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি হইবে। একমাত্র ককেশাসের পার্ব্বত্য প্রদেশেই ত্রিশটি বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে এবং তাহাদের সংখ্যা হইবে ষাট-সত্তর লক্ষ। জর্জিয়ান্ জাতি ইহাদেরই অন্তর্গত। ইহা ছাড়া এলবুর্জ পর্ব্বতের উপত্যকায় আছে ক্যাবার্ডিন, আর কাম্পিয়ান সাগরের নিকটে আছে আজারবাইজান্।

উল্লিখিত জাতি সমূহের কোন কোন জাতি পূর্ব্ব

হইতেও কিছু উন্নত ও বীরভাবাপন্ন। হোয়াইট্ রাশিয়ান্‌ বা শ্বেতরুশদিগকে এইরূপ জাতি বলিয়া উল্লেখ করা যায়। সংখ্যায় ইহারা প্রায় এক কোটি। কিন্তু বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী জার্ম্মানগণ মস্কো পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া ইহাদের তিন লক্ষ লোককে হত্যা করিয়াছিল।

ইউক্রেনিয়ান্‌গণ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ-দেহ; ইহাদের গায়ের রং কিছু কালো। রাশিয়ার ইউক্রেন্‌ অংশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাকে রাশিয়ার 'শস্য-ভাণ্ডার' (Granary) বলা হয়।

ইউক্রেনিয়ান্‌গণ বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। যে কসাক সৈন্যের তরবারি-নৈপুণ্য ও অশ্বচালনার খ্যাতি আবহমান কাল হইতে বিশ্ববিশ্রুত, সেই কসাকগণ ইহাদেরই একটি শাখা মাত্র এবং এই ইউক্রেন-অঞ্চলেরই অধিবাসী। মহাযুদ্ধের বিজয়-গৌরবের যথার্থ অংশীদার রূপে কসাকদিগের নামোল্লেখ করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

গ্রেট্‌ রাশিয়ান্‌রাও তাহাদের বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। ইহারাই রুশ-সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে ক্ষমতাশালী ও সুবিস্তৃত করিয়াছিল। মস্কো নগরীতে রাশিয়ান্‌দিগের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নহে—প্রায় দশ কোটি হইবে।

ককেশাস্‌ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যে ত্রিশটি বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে, তাহারাও সুনিপুণ যোদ্ধা, সবল, দীর্ঘদেহ ও দীর্ঘায়ু। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে জর্জিয়ান্‌

জাতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহাদেরই ভিতর হইতে রুষ্টাভেলি নামে যে এক মহাকবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার রচিত এক মহাকাব্য আজও জাতীয় সমৃদ্ধির নিদর্শন রূপে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পার্ব্বত্য-প্রদেশের অধিবাসী ইহারা। বন্ধুর কর্কশ পথে চলিতে ইহারা অভ্যস্ত। ইহাদের দেহ এবং মনও তদনুরূপ ভাবে গঠিত—স্বাধীন বন্যমৃগের ন্যায় ইহারা একমাত্র স্বাধীনতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। সুতরাং রাজশক্তির যথেচ্ছাচারিতা ইহারা কখনও নত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লয় নাই।

এই প্রদেশের প্রধান নগর তিফ্‌লিশ। তিফ্‌লিশের থিওলজিক্যাল কলেজে মহাবীর ষ্ট্যালিন তাঁহার তরুণ বয়সে ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। আর গোরি পর্ব্বতের সানুদেশে তাঁহার জন্ম। সুতরাং স্বভাবতঃই পর্ব্বতের কাঠিন্য ও উন্নত আদর্শ তাঁহাকে যে উত্তরকালে জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের অন্যতমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাতে আর সন্দেহের কি আছে?

যে নগণ্য গৃহে ষ্ট্যালিনের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার সেই পাতার কুটীরখানিকে আজ একটি সুরক্ষিত যাদুঘরে পরিবর্ত্তিত করিয়া দর্শনীয় স্থানে পরিণত করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে যে কয়েকটি জাতির কথা এখানে উল্লেখ করা হইল, ইহা ছাড়া, আরও অসংখ্য জাতি তাহাদের বিভিন্ন

দেশাচার ও ধর্ম্মমত লইয়া কত সুদীর্ঘকাল কত দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যেই না বাস করিতেছিল ! তখন যারতন্ত্রীয় প্রভুশক্তিরই আকাঙ্ক্ষা ছিল—অধিবাসিগণ তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্মমতের জন্য পরস্পর সংঘর্ষ করিয়া মরুক এবং তাহারা অশিক্ষার নিম্নস্তরে নিমজ্জিত থাকিয়া জ্ঞান-দৃষ্টির সৌভাগ্য হইতে চির-বঞ্চিত হইয়া থাকুক। কিন্তু মহামতি লেনিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ষ্ট্যালিন প্রভৃতির অপরিসীম কৃতিত্বের ফলে তাহারা আজ সুশিক্ষিত হইয়া নিজেদের প্রকৃত কল্যাণের পথ খুঁজিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং ভেদ-নীতির সাহায্যে রুশ-সম্রাট্ জনসাধারণকে যে অপমান করিয়া আসিতেছিলেন, এবং জনসাধারণও তাহাদের অজ্ঞানতা ও ধর্ম্ম-মোহবশতঃ নিজেদের আত্মাকেই যেভাবে অপমান করিয়া আসিতেছিল, শুভ মুহূর্ত্তে নূতন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অপমানের কুজ্ঝটিকা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেছে।

অতএব আজ বিশ্বকবি মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও অসঙ্কোচে বলিতে পারি,—

“সোভিয়েটরা রুশ সম্রাট্‌কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্ম্মিকেরা ওদের যতই নিন্দা করুক, আমি নিন্দা করতে পারবো না। ধর্ম্ম-মোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।”

বিপ্লবী রাশিয়া

সোভিয়েট রাশিয়া আজ পৃথিবীর মধ্যে এক অতুলন গণতন্ত্র! কিন্তু মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কে কল্পনা করিতে পারিত যে, রাশিয়ার ইতিহাসে এরূপ একটা নূতন অধ্যায়ের রচনাও একদিন সম্ভব হইতে পারে ?

রাশিয়ার জন-সাধারণ তখন পঙ্গু, ক্লীব, লাঞ্ছিত ও ব্যথা-বেদনার যূপকাষ্ঠে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে তাহাদের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা-স্পৃহা রুদ্ধ নিশ্বাসে গুমরিয়া উঠিত বটে, কিন্তু প্রকৃত রন্ধ্রপথের অভাবে তাহারে স্ফুরণ কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

স্ফুরণের প্রথম সূত্রপাত হইল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে—রুশ-জাপান যুদ্ধের অব্যবহিত পরে। রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনে রুশ-জাপান যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতি এক চুরপণেয় কলঙ্ক ও মসীলিপ্ত ইতিহাস। ক্ষুদ্র জাপানের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া বিশালকায় রাশিয়া পরাজয়ের অপমান মাথায় তুলিয়া লইল; সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার জন-সাধারণ মানসিক

ঐশ্বর্য্যে ও অর্থনীতিক বলে সর্ব্বহারা হইয়া, একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। সুতরাং শোষক-সম্প্রদায় ও শাসকবর্গের অত্যাচার ও হুমকি সহজে বরদাস্ত করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। আর ইহারই ফলে হইল, ১৯০৫ সালে 'অক্টোবরের বিদ্রোহ'।

বিদ্রোহ হইল বটে, কিন্তু প্রবল-প্রতাপশালী সম্রাট্ তাঁহার সম্রাজ্ঞীর পরামর্শে অতি কঠোর হস্তে তাহা দমন করিয়া ফেলিলেন। বুভুক্ষু প্রজাবর্গ—উদরান্ন-সংস্থানের আশায় যাহারা সম্রাটের নিকট আসিয়াছিল আবেদন জানাইতে, জ্বলন্ত লৌহগুলিতে বক্ষ শীতল করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইল!

ইহার পর—১৯১৪ সালে সুরু হইল পৃথিবীর 'মহাযুদ্ধ'। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রশক্তি-রূপে রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। রাশিয়ার বীর সৈনিকগণ প্রচণ্ড বিক্রমে জার্ম্মাণীকে আঘাত হানিতে লাগিল।

কিছুকাল ভালই চলিল—রাশিয়ার জয়-গৌরবে জার্ম্মাণ-বাহিনী বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অবশেষে—প্রধানতঃ সরবরাহ-বিভাগের অযোগ্যতা-বশতঃ রাশিয়ার বীর-ধমনীতে রক্ত-প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিল—এবং অচিরেই আরম্ভ হইল বিপর্য্যয়ের ধারাবাহিক আলোড়ন!

মাত্র দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই, মহাযুদ্ধের দরুণ রাশিয়ার খাদ্য-শস্য ও অর্থ-সম্পদ অজস্র ব্যয়িত হওয়ায়,—১৯১৬ সালের শীতকালেই রাশিয়ার জনসাধারণ দুর্দ্দশার অতি

নিম্নস্তরে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হইল। গ্রামে, নগরে,—এমন কি মস্কোর মত সহরে এবং তীব্র শীতের রাত্রিতেও, নির্দিষ্ট সামান্য পরিমাণ রুটি সংগ্রহের আশায় দরিদ্র প্রজাবর্গ সারারাত উন্মুক্ত রাজপথে ও প্রান্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিত। তদুপরি উৎকোচ, পক্ষপাতিত্ব ও অভিজাত প্রভৃতি নানা দুর্নীতি যেন জাতির মধ্যে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল।

বাহিরে যখন এই অবস্থা, সম্রাটের প্রাসাদেও তখন এক জীবন্ত শনিগ্রহের অস্তিত্ব সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল। এই জীবন্ত শনিগ্রহ—রাস্‌পুটিন্‌ নামে এক সন্ন্যাসী—রাশিয়ার ইতিহাসকে চির-কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

সম্রাজ্ঞীর উপর তাহার প্রভাব ছিল অসাধারণ। মহা-প্রতাপশালী রুশ সম্রাটের মহিষীকে স্বীয় করতলগত করিয়া রাস্‌পুটিন্‌ রাজ্য মধ্যে যাহা খুশী তাহাই করিয়া যাইত—লোকের জীবন ও মান-মর্য্যাদা এই স্বেচ্ছাচারী সন্ন্যাসীর অঙ্গুলি হেলনে ভূমিতলে লুটাইতে লাগিল।

ইহার ফলে, অবশেষে কেবল জনসাধারণের মধ্যেই নহে, সম্রাট্‌ ও সম্রাজ্ঞীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও—অর্থাৎ অতি সম্ভ্রান্ত দলের মধ্যেও তীব্র অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা রাস্‌পুটিন্‌কে পৃথিবী হইতে জন্মের মত সরাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। প্রথমে দু' একবার তাঁহারা ব্যর্থ-মনোরথ হইলেও রাস্‌পুটিন্‌কে অবশেষে যথার্থ ই চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে হইল।

অবস্ত-চরিত্র রাস্পুতিন্‌কে এতদিন প্রশ্রয়দানের জন্ত এবং প্রজাদের ক্রম-বর্দ্ধমান দারিদ্র্য ও অশান্তির জন্ত, সম্রাস্ত মহলের অনেকে সম্রাট্‌কেই দায়ী করিলেন ; সুতরাং কেহ কেহ সিংহাসন হইতে সম্রাট্ নিকোলাসকে অপসারিত করিয়া, তৎস্থলে তাঁহারই ভ্রাতা ডিউক মাইকেলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিলাষী হইলেন।

১৯১৭ সালের প্রথম হইতেই যেন অশান্তি ও রাজ-বিদ্বেষ চরমে পৌঁছিল। জানুয়ারী মাসে প্রথমে দেখা দিল শ্রমিক-বিদ্রোহ। মস্কৌ সহরে কারখানা সমূহের হাজার হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিল। ফেব্রুয়ারী মাসে রাজধানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক কারখানাও (পুটিলভ কারখানা, Putilov works) ধর্ম্মঘটে যোগদান করিল। সম্রাটের সিংহাসন-ত্যাগ দাবী করিয়া এখানে-সেখানে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইল।

রাজশক্তি এই সঙ্কটকালে অলস রহিল না—সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা বন্ধ করিবার জন্য সেনা-বাহিনী নিয়োজিত হইল। কেবল তাহাই নহে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য, ও জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য, সৈন্যদিগকে গুলি করিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য, নিরস্ত্র জনসঙ্ঘের উপর গুলি চালাইতে বুঝি সেনা-বাহিনীর পাষাণ-হৃদয়েও বিবেকের দংশন অনুভূত হইল। তাহারা গুলি চালাইতে অস্বীকার তো করিলই, অধিক[illegible] কোন কোন স্থলে জনতার

ধর্মে যোগদান করিয়া রাজশক্তির বিপক্ষ দলভুক্ত হইয়া দাঁড়াইল।।

মার্চ মাসে অবস্থা হইল আরও গুরুতর। রাশিয়ার 'ডুমা' বা পার্লিয়ামেন্টের প্রেসিডেন্ট অনন্তোপায় হইয়া ১১ই তারিখে সম্রাট্‌কে টেলিগ্রাম করিলেন, "অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে।" পরদিন তিনি পুনরায় টেলিগ্রাম করিলেন, "অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে।"

সম্রাট্ নিকোলাস্ তখন রাজধানীর বাহিরে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার এখন আর এমন কোন সেনা-বাহিনী নাই, যাহাদের উপর তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে পারেন। সুতরাং তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

তাহাই হইল—প্রবল-প্রতাপান্বিত দর্পান্ধ সম্রাট্ নিকোলাস্ জনমতের দাবীতে, তাহাদেরই অনুকূলে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন; আর ডুমার বিরুদ্ধ পক্ষ তৎক্ষণাৎ এক অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠন করিলেন।—

সম্রাট্ নিকোলাসের আমলে যাঁহারা মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদের কেহই এই নূতন অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্টে স্থান পাইলেন না। অস্থায়ী গভর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী হইলেন প্রিন্স্ লোভ্ (Prince Lvov)। কিন্তু জুলাই মাসেই প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন কেরেন্‌স্কি। তাহার সামান্য কয়েক দিন পূর্ব্বে—মে মাসেও তিনি সমর বিভাগের মন্ত্রী, অর্থাৎ মন্ত্রিবর্গের মধ্যে অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে পরিচিত হইলেন।

সোভিয়েট্ রাশিয়ার জন্মদাতারূপে যে শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী মহামতি লেনিনের নাম আজ জগৎ-প্রসিদ্ধ, রাশিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে তখনও তিনি কোন শক্তিশালী দল গঠন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু রাশিয়ার এই পরিবর্ত্তন তিনি অতি ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন; এবং তিনি তাঁহার লেখা ও বক্তৃতার মারফৎ পুনঃ পুনঃ কেবল এই কথাই প্রচার করিতেছিলেন যে, পরিবর্ত্তন (Revolution) যখন আসিয়াছে তখন তাহা সম্পূর্ণ হওয়াই সঙ্গত।

তিনি বলিলেন, "রাশিয়ার সমগ্র ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ধনী জমিদারদিগের যাবতীয় জমি চাষীদিগকে বিলাইয়া দিতে হইবে; এবং রাশিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের দয়ার উপর নির্ভর করিবে না—সমগ্র ক্ষমতা বিভিন্ন 'সোভিয়েট্' বা 'সমিতির' প্রতিনিধিবর্গের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে"।

কেরেন্স্কির গভর্ণমেণ্ট অবশ্য অনেকটা অনুরূপ আশা-ভরসাই দিয়াছিলেন। চাষীদের উন্নতি-সূচক বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনা হইবে এরূপ ভরসাই প্রায় পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করা হইল না। ইহাতে চাষী ও দরিদ্র জনসাধারণ ক্রমশঃই উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের দাবানল তখন পর্য্যন্ত নিভিয়া যায় নাই; রাশিয়া তখনও জার্মানীর বিরুদ্ধ পক্ষ। কিন্তু সুদীর্ঘকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় রাশিয়ার অস্ত্র-শস্ত্র ও ধন-সম্পদ রাশিয়া

হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছিল। সুতরাং রাশিয়ার দরিদ্র অধিবাসিগণ ক্রমশঃই অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিল। তাহা চূড়ান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিল যখন জুলাই মাসে জার্ম্মাণীর নিকট রাশিয়ার এক পরাজয় সঙ্ঘটিত হইল। এই পরাজয়ের ফলে আগষ্ট মাসে বাল্‌টিক্ সাগরের তীরবর্ত্তী রীগা বন্দরটি রাশিয়ার হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

রাশিয়ায় তখন একেই খাদ্য-সমস্যা ও আর্থিক সমস্যা,—তদুপরি এই পরাজয়ের গ্লানি! সুতরাং বিভিন্ন সোভিয়েটের মারফৎ রাশিয়ার বিরুদ্ধ জনমত তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

দেশের ধনী ব্যবসায়িগণ ও উচ্চ-মর্য্যাদাসম্পন্ন সেনানীবৃন্দ ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা এই সকল 'সোভিয়েট' বা জন-সমিতি দমন করিতে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সমবেত-কণ্ঠে বলিলেন, "সোভিয়েটগুলির শান্তি ও শৃঙ্খলা-বিরোধী অপপ্রচার এবং সৈন্যদিগের শৃঙ্খলা-ভঙ্গ, এই উভয় কারণেই আমাদের হাত হইতে রীগা খসিয়া পড়িল!"

সেনাপতি কর্ণিলভ্ (General Kornilov) ছিলেন তখন সৈন্য-বিভাগের কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ বা সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক। তিনি প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই উচ্ছ্বসিত তিক্ততার সুযোগে, নিজে প্রধান মন্ত্রী হইয়া সামরিক শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে রাজধানীর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন প্রধান

মন্ত্রী কেরেন্‌স্কির নিকট এক চূড়ান্ত পত্র পাঠান হইল যে, অবিলম্বে সমস্ত ক্ষমতা জেনারেল কর্ণিলভের অনুকূলে হস্তান্তর করিতে হইবে; তবে কেরেনস্কিকে ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে রাখা যাইতে পারে।

জেনারেল কর্ণিলভের এই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য জন-পরিষদ বা সোভিয়েটগুলি এবং বাণিজ্য-পরিষদ্‌ বা ট্রেড্‌-ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদিগের এক সৈন্যদল গঠন করিলেন। পরবর্ত্তীকালে ইহারাই "লাল ফৌজ" (বা Red Army) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সেনাপতি কর্ণিলভের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল—সোভিয়েট-গুলির আবেদন-নিবেদনে সারা দেশ একযোগে কর্ণিলভকে আঘাত করিল—কর্ণিলভের নিজের সৈন্য-বাহিনী পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রতারণা করিল—তাহারা তাঁহার আদেশ পালনে বিমুখ হইল।

লেনিন এই সময় ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত প্রদেশে এক চাষীর কুটীরে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। কারণ, সম্রাট্‌ নিকোলাসের আমলে তিনি যেরূপ সশঙ্ক জীবন যাপন করিতেছিলেন, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত হইলে, কেরেন্‌স্কির আমলেও তাঁহাকে প্রায় সেই ভাবেই জীবন যাপন করিতে হইতেছিল।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের যাঁহারা সদস্য, তাঁহাদের কেহ ছিলেন 'মেন্‌শেভিক্‌' দলের লোক, আর কেহ ছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবপন্থী' (Social Revolutionaries) দলের লোক। 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক সঙ্ঘ' (Social Democratic Labour Party) নামে রাশিয়ায় বহু পূর্ব্ব হইতেই একটি দল ছিল। লেনিন ছিলেন সেই দলের সদস্য।

কিন্তু একই 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-সঙ্ঘ' ক্রমশঃ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যবশতঃ দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৯০৩ সালে শ্রমিক-সঙ্ঘের কংগ্রেসে উক্ত দুই দলের মধ্যে সংখ্যাধিক দলের নাম হয় 'বল্‌শেভিক্', আর সংখ্যালঘু দলের নাম হয় 'মেন্‌শেভিক্'। রুশ ভাষায় 'বল্‌শেভিক্' শব্দের অর্থ 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' বা 'বড়দল', আর 'মেন্‌শেভিক্' শব্দের অর্থ 'সংখ্যা-লঘিষ্ঠ' বা 'ছোট দল'। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর হইতে এই 'বল্‌শেভিক্' দলের নামই 'কম্যিউনিষ্ট্ পার্টি' (Communist Party) হইয়াছে।

লেনিন্ ছিলেন বল্‌শেভিক্ দলের লোক। কিন্তু নূতন অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে বল্‌শেভিক্ দলের কোন প্রাধান্য ছিল না মেন্‌শেভিক্ আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবপন্থী, এই উভয়ের সমবায়ে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত ছিল। প্রধান মন্ত্রী নিজে ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবপন্থী দলের লোক। এইজন্য বল্‌শেভিক্ লেনিনের জীবন ও স্বাধীনতা একেবারেই বিপন্মুক্ত ছিল না।

লেনিন তাহা উপলব্ধি করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবদিগের পরামর্শে, ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত-প্রদেশে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু র'শয়ার অন্তর্বিদ্রোহের সংবাদ

পাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি স্বদেশে ছুটিয়া আসিলেন।

ঘটনার গতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিলেন, এখন আর কোন মধ্যপন্থা নাই। হয় সোভিয়েট্‌দিগের গণ-আন্দোলনকেই জয়যুক্ত করিতে হইবে, নতুবা যাবতীয় সোভিয়েট্‌-আন্দোলনকে দাবাইয়া দিয়া সৈন্য ও ব্যবসায়ীদিগের বিশ্বাসভাজন কর্ণিলভের ন্যায় কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকেই আধা-সামরিক একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে।

তিনি স্থির করিলেন, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্টই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার প্রথমে অভিপ্রায় ছিল যে, অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্টের অন্তর্গত "মেনশেভিক্" ও "সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবপন্থী" (Social Rovolutionaries), এই উভয়ের সংমিশ্রণেই সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ঐ উভয় দলই একযোগে তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে ভালবাসে, তিনি তখন তাঁহার সেই মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন।

তিনি তখন সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহার বল্‌সেভিক্ দলের সাহায্যেই তিনি সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবেন; এবং প্রয়োজন হইলে, প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টকে বলপূর্ব্বক দূরীভূত করিয়া, তিনি তৎস্থলে নূতন গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবেন।

ইতিমধ্যে শ্রমিক, চাষী ও দরিদ্র জন-সাধারণের জন্য

বল্‌সেভিক্ মতবাদের সহানুভূতি দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। দেশের সৈন্য-সামন্ত, বিশেষতঃ বাল্টিক রণতরী বহরের নাবিকগণ, বলশেভিক্ পার্টির আন্দোলনে খুবই সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিল; তাহারা সকলেই যেন কিসের প্রতীক্ষায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া রহিল!

মোট কথা, রাজধানীতে ও রাজধানীর বাহিরে,—সর্ব্বত্রই একটা নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল,—সর্ব্বত্রই মহা-আন্দোলন ও এক চাঞ্চল্য! বল্‌শেভিক্ মতবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল, এখানে-সেখানে সোভিয়েট্‌গুলি বল্‌শেভিক্ ভাবাপন্ন হইয়া গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে লইবার পক্ষপাতী হইল—ফল্গুনদীর অন্তর্নিহিত স্রোতের ন্যায় বল্‌শেভিক্ মতবাদ সঙ্গোপনে—কেমন করিয়া—আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল!

লালফৌজের ছোট ছোট দল যখন-তখন কুচ-কাওয়াজ করে, চাঁদমারিতে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করে; মাঝে মাঝে রাজধানীর বাহিরে 'ক্রোনষ্টাড্' বন্দরে—নৌ-ঘাঁটির নাবিকদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান ও সংযোগ রক্ষা করে।—

এই ভাবে চলিল কিছুকাল। অবশেষে আসিল ৭ই নবেম্বর।—

৭ই নবেম্বর, রাত্রি ২টা। সমগ্র নগরী সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে—সুখ-সুপ্ত কতজনের অতৃপ্ত বুকে কত সোনার স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক সময় 'সপ্তম রেড্‌গার্ড' বাহিনী

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া রাজধানীর প্রধান দখল করিয়া বসিল!

রেলওয়ে ষ্টেশন, টেলিগ্রাফ আফিস, নেভা নদীর সেতুগুলি, চৌরাস্তার মোড়, বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্রগুলি,—রাজধানীর সব কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ, একে একে তাহাদের দখলে আসিয়া গেল!

সম্রাটের 'উইণ্টার প্যালেস্,'—১৯০৫ সালে একদিন যাহার সম্মুখে ক্ষুধার্ত্ত জনসঙ্ঘ সম্রাটের নিকট তাহাদের উদরের অভিযোগ জানাইতে গিয়া বন্দুকের গুলিতে চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই 'উইণ্টার প্যালেস' এখন প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের প্রধান দপ্তরখানা। তাহার চতুষ্পার্শ্বে যেন যাদুমন্ত্রে অগণিত সশস্ত্র সৈনিক কোথা হইতে উদ্ভূত হইল!—কেরেনস্কি-গভর্ণমেণ্টের সদর দপ্তরখানা মুহূর্ত্তমধ্যে অবরুদ্ধ হইল!

অদূরে ক্রোনষ্টাড্ বন্দর। তাহার পাদদেশ স্পর্শ করিয়া 'অরোরা' নামে একখানি যুদ্ধ-জাহাজ ধীরে ধীরে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল, এবং অবশেষে উইণ্টার প্যালেসের যথাসম্ভব নিকটে আসিয়া, সমস্ত কামানগুলির মুখ সেই দিকে ফিরাইয়া বিরাট রাক্ষসের মত মুখ ব্যাদান করিয়া বসিয়া রহিল!

প্রভাত হইতে না হইতেই সব কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রধান মন্ত্রী কেরেনস্কি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট (Provisional Government) আত্ম-সমর্পণ

করিল, এবং তাহারই সমাধিক্ষেত্রে এক নূতন সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল, আর তাহার সর্ব্বাধিনায়ক হইলেন মহামতি লেনিন।

রাশিয়ার ইতিহাসে ইহাই '১৯১৭ সালের নভেম্বর-বিদ্রোহ' নামে সুপরিচিত হইয়া আছে। ১৯০৫ সালে যাহা বিফলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, ১৯১৭ সালে তাহাই সার্থক হইয়া উঠিল।

শাসন-ব্যবস্থা

'বিপ্লব' বলিতে সাধারণতঃ বিশেষ কোন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব সাধিত হইল তাহা শুধু সে দেশের প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন করে নাই, 'জারের' শাসনকালীন সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাকেই নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে! কিরূপে তাহা সম্ভব হইল, একটু চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

কোন দেশের প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা যখন এমন স্তরে নামিয়া আসে যে, তাহাতে জনসাধারণের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন প্রতিষ্ঠিত সর্ব্ব-বিভাগেই পরিবর্ত্তনের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। সমগ্র দেশ তখন এরূপ একটি ব্যবস্থার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে, যে ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সে দেশের জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইতে পারে। যে বিপ্লব সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করিতে পারে তাহাই সার্থক বিপ্লব। এই

হিসাবে রাশিয়ার বিপ্লবকে যথার্থই সার্থক বিপ্লব নামে অভিহিত করা যায়।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব আসিয়া গেল, এবং দেশের সর্ব্বব্যবস্থায় যাহাতে এক বিপুল বিপর্য্যয় আনিয়া দিল, সারা বিশ্ব তাহাতে দীর্ঘকাল অবিশ্বাসের ভ্রূ-ভঙ্গীর সঙ্গেই দৃষ্টিপাত করিল মাত্র! এত বড় একটা পরিবর্ত্তন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সর্ব্ব বিভাগেই এরূপ একটা বিপর্য্যয় যে সম্ভব হইতে পারে, তাহা কেহ ধারণাই করিতে পারে নাই,—সুতরাং রাশিয়ার বিপ্লবকে প্রধানতঃ একটা রাজনৈতিক বিপ্লব বলিয়াই সকলে মনে করিয়াছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধে নাৎসী জার্ম্মাণীর ধ্বংসের মধ্যে এই অবিশ্বাসের বীজ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

নাৎসী জার্ম্মাণীর ধ্বংসের মূলে প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার লালফৌজের অসামান্য কৃতিত্ব। সেই কৃতিত্বের কারণ কেবল লালফৌজের যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও দুর্দ্ধর্ষ সাহস এবং জনসাধারণের ত্যাগ ও ধৈর্য্যশক্তিই নহে, রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বন্দোবস্তকেই তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। যে রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থার বলে যুদ্ধকালে, চরম সঙ্কটের মুহূর্ত্তেও সমগ্র রাজ্যের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এবং জনসাধারণ দুর্দ্দশার নিম্নস্তরে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, তাহা সমগ্র জগৎকে বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ করিয়া দিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে, বিশৃঙ্খল যুদ্ধের আবহাওয়ার

মধ্যেও, যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দেশ ও জাতিকে সুশৃঙ্খল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং অবশেষে সাফল্যের উজ্জ্বল কিরীটে স্বদেশ ও স্বজাতিকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছে, তাহা একেবারেই উপেক্ষার নহে। পক্ষান্তরে এরূপ রাষ্ট্র ও তাহার বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে যত বেশী আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল।

বিপ্লবান্তে, মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রাশিয়া তাহার সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে যে, আজ যে-কোন দেশে, যে-কোন সঙ্কটের সমাধান হিসাবে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়। কেবল তাহাই নহে, অপরাপর দেশ সমূহে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের শত-সহস্র প্রতিকূল ব্যবস্থা সত্ত্বেও নব-জাগ্রৎ রাশিয়ার ভাবধারা প্লাবনের জলধারার ন্যায় সকলকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে! ইহার কারণ, সার্ব্বজনীন কল্যাণকর বিধি-ব্যবস্থাকে স্বভাবতঃই কোন রাষ্ট্র ঠেকাইয়া রাখিতে পারেনা; জন-সাধারণ তাহা নিজেদের প্রয়োজন বোধেই স্বীকার করিয়া লয় ও সাদরে গ্রহণ করে।

এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে বলশেভিক নেতৃবৃন্দের ক্ষতি ও রক্তক্ষরণ নিতান্ত কম সহ্য করিতে হয় নাই! প্রচুর রক্তপাত তাঁহারা নিজেরা তো সহ্য করিয়াছিলেনই, অপরের রক্তপাত তাঁহারা যে পরিমাণে করিয়াছিলেন তাহাও অপরিমিত ও ভয়ঙ্কর! সুতরাং রক্তবন্যার মধ্য হইতেই বিপ্লবের বিজয়-সিংহাসন উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আজ স্বীকার করিতে হইবেই।

এইজন্য এক শ্রেণীর সমালোচক ইহাকে চরম নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিক মারণ-যজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কিন্তু রাশিয়ার তদানীন্তন ইতিহাসের পর্য্যবেক্ষণকারী ইহাও অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, বলশেভিক নেতৃবৃন্দের এই মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্যতীত বর্ত্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব হইত! বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে, বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তিকে অন্য কোন প্রকারে পর্য্যুদস্ত করিবার তাঁহাদের উপায় ছিল না। সুতরাং বিরাট অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ও মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদের উপরে কল্যাণের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদিগকে প্রথমে রক্তপাতের পন্থাই বাছিয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর-মুহূর্ত্তে, মঙ্গল-ঘট প্রতিষ্ঠার পর-ক্ষণেই তাঁহারা তাঁহাদের তরবারি কোষবদ্ধ করেন।

কেবল তাহাই নহে। বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে তাঁহারা পুঁথি-পুস্তক, সভা-সমিতি ও নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়া রাশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিপীড়িত রুশ জনসাধারণের মধ্যে যে আশার বাণী প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন, রাষ্ট্র-ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াই সেই প্রতিশ্রুতি তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তৎপর হইলেন। সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্লেটো হইতে কার্ল মার্কস পর্য্যন্ত দুনিয়ার জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিপ্লবী নেতা লেনিন যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন, সেই নবলব্ধ শান্তিসুধা তিনি রুশ জনসাধারণের নাগরিক জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে এক অসম্ভব

ভূ-স্বর্গের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সুযোগ্য শিষ্য ষ্ট্যালিন আজ সেই ভিত্তির উপরে সুরম্য সৌধ নির্মাণ করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত জগৎ আজ স্তব্ধ-বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে!

বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল, নিঃস্ব জনসাধারণকে দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদের মালিকানা স্বত্ব দেওয়া। কিন্তু মুষ্টিমেয় গুটিকয়েক ধনী পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত ভাবে যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের স্বামিত্ব বা মালিকানা-স্বত্বের বিলোপ সাধন ব্যতীত, দেশের আপামর-জনসাধারণ যাবতীয় ধন-সম্পদের অধিকারী হইবে কিরূপে? আর তাহা ব্যতীত সর্ব্ব-সাধারণের কল্যাণই বা হইবে কিরূপে?

বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ ইহা ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, দারিদ্র্য ও হাহাকার লইয়াই যদি জন-সাধারণকে জীবন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে বিপ্লবের উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল! সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কথা, জন-সাধারণের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি—এই সব বড় বড় শ্রুতি-সুখকর কথাগুলির মূল্য যে তাহা হইলে কিছুই থাকেনা। সুতরাং আইন-কানুন ও শাসন-ব্যবস্থা তাঁহারা এরূপ আকারে গড়িয়া তুলিলেন, যাহাতে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য আর ব্যক্তি-বিশেষের হাতেই সীমাবদ্ধ না থাকে। সেই সঙ্গে তাঁহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন, যাহাতে কোনরূপ ফাঁকি ও অসামঞ্জস্যের

ফাঁক ধরিয়া মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ যেন আর কোনরূপেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত করিতে না পাবে।

এই সব অসাধ্য-সাধন করিতে বিপ্লবী নেতাগণ অবশ্য একদিনেই সমর্থ হন নাই। ক্রমাগত আঘাতের কষ্টি-পাথরে তাঁহাদেব ধৈর্য্য ও মনোবলেব অসাধারণ পরীক্ষা হইয়া গেলে, শত রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী অবস্থায় আসিতে হইযাছে। বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতেও তাঁহাদের নিতান্ত কম দুর্ভোগ হয় নাই। অনবরত শক্তিশালী ধনিক শ্রেণীব সঙ্গে তাঁহাদিগকে লড়াই করিতে হইয়াছে—ধনিক শ্রেণীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দয়া-মায়া ইত্যাদি সুকুমাব বৃত্তি সমূহকে একেবাবে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল।

কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিপ্লবী বল্‌শেভিক নেতৃবৃন্দের চরম উদ্দেশ্য ছিল, অধিক-সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণে কল্যাণ-সাধন ("Greatest good to the greatest number")। সুতরাং এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহাদিগকে যদিই বা কিছু নির্ম্মম পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে পন্থা কল্যাণেব পন্থা, এবং এই একটি কারণেই তাহা সমর্থনযোগ্য।

যাহা হউক, নূতন সমাজতন্ত্রক গভর্ণমেন্ট ১৯১৭ সালের

১৫ই নবেম্বর তারিখে এক ঘোষণা প্রচার করিয়া সমস্ত রুশ জনসাধারণকে জানাইয়া দিলেন :—

"সকল প্রদেশের অধিবাসীরাই স্বহস্তে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন করিতে পারিবে এবং তাঁহারা নিজেদের সুবিধামত গণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করিবে। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবেনা। দেশের যাবতীয় সম্পত্তির উপরেই যোগ্যতা-অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার থাকিবে। অযোগ্য ব্যক্তিরাও যাহাতে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া দেশের ধনসম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন বৃদ্ধি করিতে পারে এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রশস্ত করিতে পারে, রাষ্ট্র বা গভর্ণমেণ্ট সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবেনা। সকলেই স্ব-স্ব ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। কেহই কাহারও অধীনে থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনা, সুতরাং সকলেই স্বাধীন,— ইহা অনুভব করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে এই স্বাধীনতাকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকলের মিলিত চেষ্টা, উৎসাহ ও শক্তি দ্বারা একটি উপযুক্ত শাসন-তন্ত্র রচনা করিতে হইবে।"

এইরূপে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল, শাসন-তন্ত্রের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে তাহা একটি প্রকাণ্ড বিস্ময়। পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকা শতাধিক বৎসরেও যাহা করিতে পারে নাই, রা[illegible] তাহা অতি অল্প দিনের

মধ্যেই সম্ভব করিয়া ফেলিল! গণতন্ত্র আজ রাশিয়ায় কেবল একটা কথার কথাই নহে, গণতন্ত্র আজ সেখানে বাস্তব। গণতন্ত্র আজও অন্যান্য দেশে প্রহসন মাত্র, কিন্তু রাশিয়ায় তাহা প্রাণবন্ত!

সুবৃহৎ রাশিয়ায় আজ জমি, কারখানা, খনি, যাতায়াত-ব্যবস্থা ইত্যাদি যাহা কিছু আছে, আজ তাহার সব-কিছুই সাধারণের সম্পত্তি। কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির কোন সঙ্ঘ বা কোম্পানী আজ কোন কারখানার মালিক নহে, খনির মালিক নহে, কোন কিছুরই মালিক নহে; সুতরাং কায়েমী স্বার্থ-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ সে দেশে আজ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, পুঁজিবাদীর দল, অর্থাৎ Capitalists আজ সেদেশ হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। দেশের মালিকানা-স্বত্ব আজ সর্ব্বসাধারণের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া অধিবাসীদের কি নিজস্ব কোন বাড়ী-ঘর নাই?—আছে বই কি। ঘর-বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, আসবাবপত্র, পুস্তক, পোষাক-পরিচ্ছদ, অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি—সবই তাঁহাদের আছে এবং তাহারা কিনিতে পারে, এবং রাখিতে পারে। ব্যয় বাদে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, সে অর্থও তাঁহারা নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু ধনোৎপাদনের জন্য সেই অর্থে কোন ব্যবসায় বা কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি খুলিয়া লাভবান হইতে

পারিবেনা। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এরূপভাবে সুনিয়ন্ত্রিত যে, যাহাতে ইহার কোন ব্যতিক্রম না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন।

এই ব্যবস্থার ফলে, সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় আজ আর কোন পুঁজিবাদী নাই। সুতরাং কি রাষ্ট্র-ক্ষমতায়, কি আর্থিক জীবনে, সোভিয়েট রাশিয়ার অধিবাসিগণ আজ পূর্ণভাবেই গণতন্ত্রের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বলা আবশ্যক, এই 'সোভিয়েট রাশিয়া' বলিতে আমরা কি বুঝিতে পারি।

আমাদের দেশে একটি কথা আছে,—'পঞ্চায়েৎ'। গ্রামের পাঁচজন মিলিয়া এক প্রকাশ্য বৈঠকের অধিবেশন করিলে তাহাকেই 'পঞ্চায়েৎ' বলা হয়। এখনও গ্রামের কত বিবাদ-বিসংবাদ ও কত সামাজিক ব্যাপারের নিষ্পত্তি কত গ্রামে পঞ্চায়েতী বৈঠকেই সমাধা হইয়া যায়! আমাদের দেশের এই 'পঞ্চায়েৎ' শব্দের পূর্ব্বে একটি 'গণ' শব্দ জুড়িয়া দিলে যাহা হয়, রাশিয়ার 'সোভিয়েট' বলিতে অনেকটা তাহাই বুঝায়।

১৯০৫ সালে, রাশিয়ায় যখন সর্ব্বপ্রথম বিপ্লবের বহ্নি শিখা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল,—সেই বিপ্লবের আদিযুগে এই সোভিয়েটের উৎপত্তি হয়। 'সোভিয়েট্' শব্দের মূল অর্থ সভা বা সমিতি (Council)। স্থান-বিশেষের অধিবাসিগণ নিজেদের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া যে সভা বা সমিতি গঠন করিত, তাহাই 'সোভিয়েট' নামে পরিচিত হইত। গ্রাম ও নগরের বহু সোভিয়েট মিলিত হইলে সোভিয়েটের

মহাসমিতি (Congress of Soviets) গঠিত হইত। সুতরাং সমস্ত সোভিয়েটই জন-সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের সঙ্ঘ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব, 'সোভিয়েট রাশিয়া' বলিতে পঞ্চায়েৎ-ব্যবস্থার শাসনাধীন রাশিয়াকে বুঝাইয়া থাকে।

আধুনিক রাশিয়ায় খনি, কারখানা, জমি, যান-বাহন, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতি শিল্প ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিভাগেই সোভিয়েট বা সমিতি গঠন করা হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই নির্ব্বাচিত কর্ম্মীরা কাজের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

সমগ্র রাশিয়ায় সোভিয়েটের সংখ্যা সত্তর হাজারেরও অধিক। এই সোভিয়েটগুলি কংগ্রেসে মিলিত হইয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। জাতির তথা জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে হইলে, কৃষিজাত ও শিল্পজাত ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যের উপযুক্ত উৎপাদন ও যথাযথ বণ্টন আবশ্যক। সোভিয়েটগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাহাই সম্পন্ন করে। সেইজন্য সোভিয়েট-সঙ্ঘ বা সোভিয়েট-সমিতির পরিচালিত রাষ্ট্রের নাম সোভিয়েট ইউনিয়ন (Soviet Union)।

কোন সোভিয়েট বড়, কোনও সোভিয়েট বা ছোট। সুতরাং সদস্য-সংখ্যাও কম-বেশী—সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন সোভিয়েটের সদস্য-সংখ্যা ২ হাজার, কোনটির ২০ জন মাত্র। সোভিয়েটের এই সদস্যগণ স্থানীয় স্কুল, রাস্তাঘাট,

শিল্প ও স্থানীয় লোকের বাসের জন্য গৃহ ইত্যাদির উন্নতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং বড় বড় উপদেশ দানই ইহাদের কার্য্য নহে। ইহারা প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইহারা অসামরিক অধিবাসীদিগকেও তাঁহাদের জিনিষপত্র স্থানান্তরিত করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

যে কোন সমস্যার সমাধান কিংবা কোন কিছু করা আবশ্যক মনে হইলে, সদস্যগণ একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া থাকেন—বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেন না। জনসাধারণের জন্য এইভাবে একত্রিত হওয়া ইহাদের নিকট স্ব-স্ব ব্যক্তিগত কাজের অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং প্রথমে সর্ব্বসাধারণের কাজ সম্পন্ন করেন, পরে নিজেদের কাজে অগ্রসর হন। অথচ জাতীয় কাজের জন্য—অর্থাৎ ব্যক্তিগত কাজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সোভিয়েটের সদস্যরূপে কার্য্য সম্পাদনের এই অত্যধিক আগ্রহের মূলে আর্থিক কোন স্বার্থই নিহিত নাই—সোভিয়েটের সদস্যরূপে তাঁহারা কখনও কোন বেতন দাবী করিতে পারেন না—কাজটি সর্ব্বতোভাবেই অবৈতনিক।

বেতন না পাইলেও সদস্যগণের দায়িত্ব নিতান্ত কম নহে। স্ব-স্ব কার্য্যের জন্য তাঁহারা জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আমাদের দেশেও এইরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের নির্ব্বাচিত সদস্যও আছে। কিন্তু সেদেশের ও

এদেশের সদস্যদিগের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমাদের দেশের সদস্যগণ একবার নির্ব্বাচিত হইয়া পরে জনস্বার্থের বিরোধী কোন কাজ করিলে, অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও, জনসাধারণের কিছুই করিবার থাকে না ; কিন্তু সোভিয়েটের সদস্যগণ সেরূপ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে এবং জনসাধারণের আস্থা হারাইলে, এক মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব ঘুচিয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদের যদৃচ্ছা চলিবার কোন উপায় নাই।

সর্ব্বোচ্চ 'সোভিয়েট-পরিষদ' (Supreme Soviet) নামে রাশিয়ায় একটি পরিষদ আছে। বিভিন্ন সোভিয়েটের অধিকসংখ্যক ভোট পাইলে এই সর্ব্বোচ্চ পরিষদের সদস্য হওয়া যায়। রাজধানী মস্কৌ সহরে ইহার অধিবেশন বসে।

সর্ব্বোচ্চ পরিষদ দুইটি শাখায় বিভক্ত। একটির নাম "কাউন্সিল অব্ ইউনিয়ন" (Council of Union") এবং অপরটির নাম 'কাউন্সিল অব্ নেশনস্' (Council of Nations)। Council of Union-এর সদস্য-সংখ্যা ৬২১ ; প্রতি চারি বৎসরে ইহার নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যেকটি সদস্যকে প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের মুখপাত্র রূপে কার্য্য করিতে হয়।

"কাউন্সিল অব্ নেশনস্" এর সদস্য-সংখ্যা ৬৭৬ ; ইহাতে প্রত্যেক প্রদেশের ২৫জন প্রতিনিধি আছে। আঠারো বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী গোপন প্রথায় (ballot system) ভোট দিয়া ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করে।

"কাউন্সিল অব্ ইউনিয়নে" যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ন

করে তাহা ১৮৯টি বিভিন্ন জাতির পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা, 'কাউন্সিল অব্ নেসনস্' তাহা বিচার করিয়া দেখেন। সুতরাং এই শেষোক্ত কাউন্সিলের কাজ অনেকটা Second chamber এর ন্যায়।

দেশের অধিবাসিগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ও বিধি-ব্যবস্থার জন্য সুপ্রিম সোভিয়েটের নিকট আবেদন করে। স্ব-স্ব প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের সেই সকল অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সুপ্রিম সোভিয়েটে আলোচনা করেন; সুপ্রিম সোভিয়েট তাহাতে মনোযোগী হইয়া প্রতিকার করেন এবং প্রয়োজন মত আইন কানুন রচনা করেন।

ঐ সকল নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রতিনিধির ন্যায় তার্কিক বা পেশাদার রাজনীতিক নহেন। অর্থের জোরে শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর করিয়া, এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহারা নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন না। সদস্যপদ লাভ করা তাঁহাদের জীবিকার্জ্জনের পন্থা নহে; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবিকার এক একটি ভিন্ন পন্থা রহিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কৃষিজীবী, কেহ শ্রমজীবী, কেহ বা শিক্ষাবিৎ পণ্ডিত, ইত্যাদি। অকৃত্রিম দেশসেবা ও নিঃসন্দেহ যোগ্যতা দ্বারাই তাঁহারা আইন-সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। নির্ব্বাচক দেশবাসীদের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাও চিরদিন ও[illegible] থাকে।

উল্লিখিত সুপ্রিম সোভিয়েট এবং তাহার দুইটি বিভাগ ব্যতীত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আরও কয়েকটি স্থায়ী কমিটি রহিয়াছে। এই কমিটির সভ্যগণ সর্ব্বতোভাবেই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত, জীবিকার্জ্জনের জন্য পৃথক্ ভাবে চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয়না—অবসর তাঁহাদের এতই কম। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাদিগকে একটা ভাতা প্রদান করা হইয়া থাকে।

এই সকল কমিটি ব্যতীত একটি স্থায়ী কার্য্যকরী কমিটিও (Permanent Executive Committee) রহিয়াছে। মোট ৪২ জন সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত। এই কমিটির যিনি সভাপতি, তাঁহার অবস্থা অনেকটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কিংবা আমাদের বড়লাটের ন্যায়। তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ক আবেদন গ্রহণ করেন এবং তাহার প্রতিকার করিয়া থাকেন।

প্রকৃত পক্ষে এই কমিটি বা Presidiumই দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। অনেকাংশে ইহা আমাদের দেশের আমলাতন্ত্রের ন্যায়। কিন্তু পার্থক্য এই যে, আমাদের আমলাতন্ত্র আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত নহে; কিন্তু এই কমিটির সদস্যগণ 'নির্ব্বাচিত' বলিয়া গৌরবজনক মর্য্যাদার দাবী করিতে পারেন। সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত না হইলেও, তাঁহারা যে পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত সে কথা স্বীকার

করিতেই হইবে। কারণ, আইন-সভার যাঁহারা সদস্য, তাহারাই এই কমিটির সদস্যদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশীয় আমলাতন্ত্রের ন্যায় ইঁহারা দায়িত্বহীন নহেন। ক্ষমতা ইঁহাদের অপরিসীম। সুপ্রিম সোভিয়েটের অধিবেশন ইঁহারাই আহ্বান করিয়া থাকেন। সরকারী আইন-কানুন যথারীতি প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, এই কমিটি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত করা ইঁহাদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের চরম সঙ্কট-কালে যুদ্ধ-ঘোষণা, সন্ধির সর্ত্ত-নির্দ্দেশ কিংবা শান্তি স্থাপন সম্পর্কে ইঁহারাই উপদেশদাতা। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণগণ যখন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তখন ইঁহারা একটি সমর পরিষদ (War Council) গঠন করিয়া, যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পাঁচজন বিশিষ্ট লোকের হাতে তুলিয়া দেন এবং জার্ম্মাণদিগের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটি দেশরক্ষা কমিটি (State Defence Council) গঠন করিয়া মহামতি ষ্ট্যালিনকে তাহার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এখন সেদেশের ও এদেশের নির্ব্বাচন-সম্পর্কেও গুটি-কয়েক কথা বলা আবশ্যক। এদেশ কেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশেও নির্ব্বাচন-প্রার্থীরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, স্ব স্ব গুণপনার বিবরণ জাহির করিয়া ভোট সংগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং এইভাবে ভোট সংগ্রহ করাকে 'ক্যান্‌ভাস্'

করা বলে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় নির্ব্বাচন হয় অন্য প্রকারে। সেদেশে নিজেদের ইচ্ছানুসারে কেহ নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন না, নাগরিকগণই উপযুক্ত কয়েকজন লোকের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভোটারদিগকে ভোট্ দিতে আহ্বান করেন। অনেক স্থলে এমনও দেখা গিয়াছে যে, ঐ ভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগেরও কেহ কেহ নিজের নাম প্রত্যাহার করিয়া তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিয়াছেন। রাশিয়ার প্রত্যেকটি লোকই দেশের কল্যাণ-কামনায় যে কতটা উদ্বুদ্ধ, এই একটি মাত্র উদাহরণেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তালিকায় লিখিত নামগুলির মধ্যে কেবল একটি মাত্র নামই অবশিষ্ট আছে, অপর সকলেই স্বস্ব নাম তুলিয়া লইয়া নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সুতরাং নির্ব্বাচনের জন্য, 'ক্যান্‌ভাসের' নামে বাগাড়ম্বর বা গালিগালাজ না করিয়া, নির্ব্বাচনকে যথার্থ মর্য্যাদা-দান করা একমাত্র রাশিয়াতেই সম্ভবপর হইয়াছে। সেইজন্য সে দেশের অধিবাসীরা অতি গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকেন, একমাত্র তাঁহাদের প্রতিনিধিরাই দেশের প্রকৃত সেবক—অন্যান্য দেশে ভোটপ্রার্থীরা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করে।

প্রায় ৭০ হাজার সোভিয়েট ও সুপ্রীম সোভিয়েটের সভ্য ব্যতীত আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবক (Volunteers) দেশের কাজে ব্রতী রহিয়াছেন। সুতরাং রাশিয়ায় একনায়কত্ব

(Dictatorship) চলিতেছে, এই অভিমতের বিশেষ কোন অর্থ হয় না। সে দেশের জন-সাধারণ যাহা কিছু করে, এমন কি ভয়াবহ মৃত্যুসঙ্কুল রণক্ষেত্রেও যে দুর্দ্দম বেগে ধাবিত হয়, তাহার মূলে কোন একনায়ক বা Dictator এর আদেশ নহে,—তাহার মূলে রহিয়াছে জন্মভূমির প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ!

রাশিয়ার অধিবাসীরা আজ পরিপূর্ণ গর্ব্বের সহিত বলিতে পারে যে, সেদেশে এখন আর কোন শোষক-সম্প্রদায় নাই। আমাদের দেশের পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট, বিচারক প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারিগণ সিন্ধুবাদ নাবিকের দৈত্যের ন্যায় আমাদের কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছে—মর্ম্মন্তুদ ব্যথা হইলেও ঝাড়িয়া ফেলিবার উপায় নাই। কিন্তু রাশিয়ার পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিচারক প্রভৃতি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত, সুতরাং জন-সাধারণের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য-বোধ অতি সজাগ ও সচেতন। সে দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ এদেশের ন্যায় মোটা মোটা বেতন লাভ করিয়া স্ফীতোদর হইতে পারেন না—স্বল্প বেতনেই পরিতৃপ্ত থাকিয়া সুষ্ঠুরূপে স্বস্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেকটি অধিবাসীই জানে ও বুঝিতে পারে যে, দেশের কাজ ও দেশের সেবা সর্ব্বসাধারণের। সুতরাং কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, প্রত্যেককেই উপযুক্ত বয়সে দেশের কাজে যোগদান করিতে হয়, এবং তাঁহাদের কেহই কাহারও উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না। বিরুদ্ধ-

বাদীদের অবস্থা নিম্মূ ল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উচ্চ শ্রেণীর অনেক লোকই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি এই চরম নিষ্ঠুরতার কুক্ষি হইতেও এক পরম কল্যাণের সৃষ্টি হইয়াছে।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—"যদিও সোভিয়েটের মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দ্দয় ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি, তথাপি সাধারণ ভাবে শিক্ষার দ্বারা, চর্চ্চার দ্বারা, ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তি বাড়িয়েই চলেছে।"

সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন আর কোন জমিদার নাই। দেশের সমস্ত জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—শ্রমিকগণ তাহাদের প্রয়োজন মত মজুরী পাইয়া থাকে। যাঁহারা বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ—শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরাণী, চিকিৎসক ইত্যাদি—তাঁহারাও স্ব-স্ব প্রয়োজন অনুসারে বেতন পাইয়া থাকেন। শ্রমিক এবং কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ-প্রতিযোগিতার সাফল্য অনুসারে পুরস্কৃত হয়। মোট কথা তাহাদের মূলনীতি হইতেছে,—প্রত্যেককেই স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিতে হইবে এবং বেতন বা মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে তাহার সংসারের প্রয়োজন অনুসারে। ("From each according to his capacity, to each according to his needs.")

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থায় কেহই পুঁজিবাদী (Capitalist) হইয়া উঠিতে পারে না, অথচ অভাব-অনটনের

কঠোর নিষ্পেষণও কাহাকেও সহ্য করিতে হয় না। সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়া যেন এক বিরাট যৌথ পরিবার!

যৌথ পরিবারের লোকেরা এক সঙ্গে একই রকম আহার-বিহারের সুখ-সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিদের উপার্জ্জন সমান নহে এবং কাজ করিবার সময় যে যতটুকু পারে ও যে যেরূপ কাজ পারে, সেই অনুসারেই কাজ করিয়া যায়। কাজের এই পার্থক্য, পরিশ্রমের কম বেশী কিংবা কম-বেশী উপার্জ্জন হইলেও আহার-বিহার ও পরিবারের সুখ-সুবিধা সকলে সমান ভাবেই ভোগ করে। ইহাতে কোন হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি না হওয়াই স্বাভাবিক। সোভিয়েট রাশিয়ায়ও আজ সেই অবস্থা। কেহ চাষী, কেহ শিল্পী, কেহ বুদ্ধিজীবী—সকলেই স্ব-স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করিয়া যায় এবং সেই ভাবে কাজ করিতে বাধ্য, কিন্তু তাহাদের মজুরী-নির্দ্ধারিত হয় তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে।

যোগ্যতা সকলের সমান থাকেনা বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি কর্ম্মক্ষম লোকের যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, যোগ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পাইতে থাকে

সোভিয়েট রাশিয়ায় আজ প্রতিভার আদর সর্ব্বত্র, সুতরা প্রত্যেকটি লোককে যোগ্য ও প্রতিভাবান্ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের এত আগ্রহ! সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যেন সর্ব্বত্রই প্রগতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। আর তাহার ফলে সারা

দেশে যে বিপুল পরিবর্ত্তন ও চাঞ্চল্য আসিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই তাহা বলিতেছি :—"যারা মূক ছিল, তারা ভাষা পেয়েচে : যারা মূঢ় ছিল, তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত ; যারা অক্ষম ছিল, তাদের আত্মশক্তি জাগ্‌চে : যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধ-কুঠরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী।"

সোভিয়েট রাশিয়ার যে কোন স্থানে পদার্পণ করিলে আজ স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, সেখানে সারাদেশে আজ যেন কর্ম্মের প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে! কে আগে কাজ করিবে, কে বেশী কাজ করিবে, সারা দেশময় আজ তাহারই এক বিরাট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে!

কর্ম্মের যেখানে এত আদর, যোগ্যতা ও প্রতিভাই সেখানে একমাত্র মাপকাঠি। কাজেই ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব কিংবা উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত আত্মীয়তার সুযোগ সেখানে প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ হইতে পারে না—সোভিয়েট রাশিয়া আজ এই সব দুর্নীতি ও পাপ হইতে বিমুক্ত এক পবিত্র ভূমি।

তবে কি উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীদের সেদেশে কোন সম্মান নাই?—আছে বৈ কি! সেদেশে তাঁহারাও সম্মানিত বটে, কিন্তু নিজেদের কৃতকর্ম্মের জন্য তাহারা অন্যকে দায়ী করেন না, নিজেরাই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লন। দায়িত্ব-বোধ তাঁহাদের এত যে, প্রত্যেকটি করণীয় কাজকে তাঁহারা নিজেদের কাজ

বলিয়া মনে করেন—ফ্যাক্টরীর মজুরেরাও ফ্যাক্টরীর কাজকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ বলিয়া মনে করে।

আমাদের দেশের মজুরদের ন্যায় তাহারা কাজ চুরি করে না, অর্থাৎ কাজে ফাঁকি দেয় না। কারণ আমাদের দেশের মজুরেরা অনুভব করে, তাহারা অপরের কাজ করিতেছে, মালিকের কাজ করিতেছে নিজেদের কোন স্বার্থ ই তাহাদের নাই। কিন্তু সেদেশের প্রত্যেকটি মজুর অনুভব করে, সে তাহার নিজের কাজ করে। জমি কল-কারখানা ইত্যাদি যেখানেই সে কাজ করুক, সেই প্রত্যেকটি জিনিষেই তাহার অংশ আছে—স্বত্ব আছে। সুতরাং সে জানে যে, কাজ কম হইলে কিংবা কোন ক্ষতি হইলে, ক্ষতি তাহারই। সে জানে, সে নিজেই নিজের মালিক। সে আরও জানে যে, জমি, খনি, কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী, যাতায়াত-ব্যবস্থা ইত্যাদি সব-কিছু হইতেই ধনিকের মালিকানা স্বত্ব তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—ঐ সব জিনিষের মালিক এখন তাহারা সকলেই—সারা দেশই এখন তাহার দাবীদার। কাজেই যে শক্তি, সাহস ও প্রতিভা জারের আমলে অনুকূল বিধি-ব্যবস্থার অভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই, আজ তাহা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ হইয়া সারা জগৎকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেছে! অশনে, বসনে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সর্ব্বত্র যে বিশ্বত্রাস শোষণ-নীতি রাশিয়ায় এতদিন চলিতেছিল, অধিবাসীরা আজ তাহা হইতে পরম মুক্তি লাভ করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গীণ শোষণ হইতে মুক্তি যে মানুষকে কতটা উচ্চস্তরে উন্নীত করিতে

পারে, তাহা সোভিয়েট ইউনিয়নের ২০ কোটি অধিবাসী আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে। তবু তো গণতন্ত্র এখনো সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা আংশিক ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে মাত্র!

পৃথিবীর যে কোন দেশে কেবল একই ভাষা বা একই সংস্কৃতি (Culture) বিরাজ করেনা। রাশিয়ায়ও তাহা নাই। বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন সংস্কৃতি রাশিয়ার সর্ব্বত্র। কিন্তু সোভিয়েট সরকার শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাশিয়াকে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কতকগুলি রিপাব্লিক, প্রদেশ ও বিভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছে।

ইহাদের প্রত্যেকটির শাসনকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিভাগের লিখিত নিয়মতন্ত্র (Constitution) আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federation) হইতে পৃথক্ হইবার (secede) অধিকার প্রত্যেকটি রিপাব্লিক বা প্রদেশেরই আছে। আইন প্রণয়ন করিবার জন্য ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থাপক সভা আছে এবং ঐ সকল আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কার্য্যকরী কমিটি আছে। ইহাদের আয়-ব্যয় ইহারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে— প্রত্যেক রিপাব্লিক বা প্রত্যেক প্রদেশেরই পৃথক্ ব্যয়-বরাদ্দ বা Budget করিবার অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য, প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ-সাহায্যও লওয়া হইয়া থাকে।

প্রদেশ বা বিভাগগুলির মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত কম

 রুশিয়ার

উন্নত, তাহাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার কিছু সীমাবদ্ধ। কিন্তু যোগ্যতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি প্রদেশের লোকই এখন অনুভব করিতে পারে যে, তাহারা পরাধীন নহে,—তাহারা স্বাধীন। বস্তুতঃ, প্রত্যেক প্রদেশের লোককে স্বাধীনতা দান করিয়া তাহাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির জন্য আবশ্যক মত অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন, আর প্রাদেশিক সরকার সেই অর্থে প্রদেশের উন্নতির সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করিয়া লন।

বিপ্লবের পূর্ব্বে, সম্রাটের শাসন-কালে রাশিয়ার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। প্রদেশগুলি ছিল যেন সম্রাটের কামধেনু বিশেষ। কাঁচামাল সংগ্রহ ও ট্যাক্স আদায়, শুধু এইজন্যই যেন প্রদেশগুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল! সম্রাট প্রদেশগুলি হইতে উৎপন্ন কাঁচামাল যথাসাধ্য আদায় করিয়া লইতেন, এবং এতদুপরি সংগ্রহ করিতেন ট্যাক্সের আকারে জনসাধারণের জীবন-শোণিত—'অর্থ'। কিন্তু বিনিময়ে অধিবাসীদের শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন না।

সুখের বিষয়, সম্রাটের কিংবা তাঁহার কর্ম্মচারীদের সেই নির্লজ্জ মনোভাব ও শোষণ-নীতি এখন একেবারেই নাই।

দেশের সর্ব্বত্রই এখন একটা ভ্রাতৃভাব বা Comradeship! যে নিজে উন্নত, সে অনুন্নতকে উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া যায়; যে প্রদেশ উন্নত, সে প্রদেশ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রদেশের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে চায়।

এইভাবে পরস্পর সহযোগিতার ফলে জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে; নূতন নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন হইতেছে এবং তাহার ফলে নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠিতেছে। অধিবাসীরা সুখী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ; স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা তাহাদের সর্ব্বাগ্রে; প্রাচুর্য্য সর্ব্বত্র—কি ঐশ্বর্য্যে, কি জনসংখ্যায়। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও কল-কারখানা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুপাতে শ্রমিকের অভাব সেখানে লাগিয়াই আছে। মোট কথা, বেকার হইবার সম্ভাবনাই সেখানে নাই।

শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতিও সেখানে আজ কম নহে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিদ্যালয় ছিলনা বলিলেও হয়। আজ সেখানে বড় বড় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। একটা বিরাট দেশের দিকে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন কেবল আলাদীনের মায়া-প্রদীপের সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষক-সম্প্রদায়ও আজ পরম মর্য্যাদা-সম্পন্ন। আমাদের দেশের চাষীরা যেমন চির উপেক্ষিত ও

অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেদেশের কৃষক ও কৃষি-ব্যবস্থা এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় বলিয়াছেন :—

"মস্কৌতে একটি কৃষক ভবন দেখতে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোট বড় সহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এসব জায়গায় কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে, যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখার উপায় করছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাশে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।"

আজ সেদেশের কৃষিকার্য্যেও বৈজ্ঞানিক স্পর্শ লাগিয়াছে। কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি, কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি, সমস্তই আজ সেদেশে বৈজ্ঞানিক। যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা (Collective Farming) সেখানে আজ অতি অল্পদিনের মধ্যে বিস্ময়কর উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব করিয়াছে।

ভাষা এবং সাহিত্যেও সেখানে আজ উন্নতির ছোঁয়াচ স্পষ্ট অনুভব করা যায়। যে সকল প্রদেশে কোন লিখিত ভাষা ছিল না, সেখানে নূতন অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে—লিখিত ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে—সাহিত্যের মাধুর্য্য ও মাদকতা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার ললিত কলাও আজ মার্জ্জিত বেশে, মার্জ্জিত রুচিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জনসাধারণের সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিতে হয়। ফলে, তাহাদের সহিত পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান ও সহানুভূতি-বোধ সহজ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জনসাধারণও রাশিয়ার চলিত ভাষা শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; কারণ, সকলেই আজ কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ কমরেড্ ষ্টালিনের গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে আগ্রহান্বিত।

মোটকথা, সংক্ষেপে বলিতে গেলে শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,—পৃথিবীর যে হতভাগ্য দেশের আকাশে বাতাসে একদিন নির্ম্মম অত্যাচারের আর্ত্তনাদ গুমরিয়া উঠিত, আজ সেখানে সাম্য ও মৈত্রীর মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। যে হতভাগ্য দেশের বক্ষ একদিন কেবল উৎপীড়িতের তপ্ত শোণিতে অভিষিক্ত থাকিত, আজ তাহাতে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় বহিয়া যায় মমত্ব ও মানবতা-বোধের করুণ রস!

শাসনতান্ত্রিক আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর কোন দেশই যাহা সম্ভব করিতে পারে নাই, রাশিয়ার বিপ্লব তাহা অতি অদ্ভুত ভাবে সম্ভব করিয়াছে! সুতরাং রাশিয়ার বিপ্লব শুধু একটা বিপ্লব নহে,—তাহা সেদেশে আলাদীনের প্রদীপ।



উজবেকীস্তানের একজন কৃষক রমণী—যৌথ-কৃষিক্ষেত্রে যাইতেছে

কৃষি ও শিল্পোন্নতি

রাশিয়া দর্শন করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ সে দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "এরা তিনটে জিনিষ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—,শিক্ষা কৃষি এবং যন্ত্র।" আমরা এই অধ্যায়ে কৃষি ও যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করিব।

আধুনিক রাশিয়া কৃষি এবং শিল্প, উভয় বিষয়েই অতিরিক্ত সচেতন হইলেও জারের আমলে রাশিয়ার অবস্থা ছিল অন্যরূপ। রাশিয়া তখন প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশরূপেই পরিগণিত ছিল। শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য তাহাকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশের উপর নির্ভর করিতে হইত।

বহির্বাণিজ্য বলিতে রাশিয়ার প্রায় কিছুই ছিল না। বহির্বাণিজ্যের মধ্যে একমাত্র তৈলই ছিল প্রধান পণ্যদ্রব্য।

রাশিয়ার তৈলখনি জগতে প্রসিদ্ধ। এমন কি, এই সুদূর ভারতবর্ষেও রাশিয়ার কেরাসিন তৈল সমধিক পরিমাণে আমদানী হইত। তৎকালে যে সামান্য গুটি কয়েক শিল্প রাশিয়ার ঊষর বক্ষে স্তিমিত ভাবে শিখা বিস্তার করিতেছিল,

তাহাতেও রাশিয়ার নিজস্ব বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল না; কারণ তাহাতেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মূলধন এমন কি, অনেক স্থলে তাহাদের পরিচালনা পর্য্যন্ত বিদেশী পরিচালকের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাশিয়ার সম্রাট্ তাঁহার প্রজাসাধারণের নিকট শাসক হিসাবে সর্ব্ব-ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইলেও শিল্প-নিয়ন্ত্রণে একেবারেই দুর্ব্বল ও ক্ষমতাহীন ছিলেন। সুতরাং রাশিয়ার নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে, নিজস্ব পরিচালনে শিল্প-বিস্তারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে—সম্রাট্ বা সম্রাটের হিতৈষী উচ্চ কর্ম্মচারিগণ সম্পূর্ণ অযোগ্যতার ইতিহাসই রাখিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজী ১৯১৪ সালে আর্চ্চ ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ডের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই পৃথিবীব্যাপী যে মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, রাশিয়ার সম্রাট্ জার নিকোলাস তাহাতে ইংরেজ ও ফরাসী প্রভৃতির মিত্রপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া জার্ম্মানীর বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য, এবং কিসের লোভে তিনি তাহা করিয়াছিলেন এব সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ ও জাতিকে এক ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের মুখে টানিয়া লইয়াছিলেন, সেই গোপন সংবাদ পৃথিবীর কয়টি লোক অবগত আছেন?—

ফ্রান্সের পণ্য—নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য কিংবা তাহার প্রসাধন-সামগ্রী,—রাশিয়ার অন্দর-মহলে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া তৎকা। সমগ্র রাশিয়াকে যে ভাবে

পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছিল, আজ অতীতের সেই গোপন ইতিহাসকে মারাত্মক ভুলের জন্যই দায়ী করিতে হয়। দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণীর শক্তির আক্রমণে ফ্রান্সের যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল, ফ্রান্স বুঝিতে পারিল যে, জার্ম্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ যদি অপর কোন দিকে প্রবাহিত করা যায়, তাহা হইলে বাঁচিবার পন্থা আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং ফরাসী গভর্ণমেন্টের প্রেরণায় ফরাসী শিল্পপতিগণ সক্রিয় হইয়া উঠিলেন; এবং অবশেষে সেই ফরাসী ধনিক শ্রেণীর চাপে রাশিয়ার মেরুদণ্ড আভূমি কুব্জ হইয়া গেল—রাশিয়া যুদ্ধে যোগদান করিয়া বসিল।

শিল্পপতি ও ধনিক শ্রেণীর চাপ রাশিয়াকে এত প্রপীড়িত করিযা তুলিয়াছিল যে, রাশিয়া তখন একবার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাইল না যে, কতটুকু তাহার শক্তি বা কতখানি সে প্রস্তুত! বলিতে গেলে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়ই সে জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে এক অপূর্ব্ব রনাঙ্গন খুলিয়া বসিল।

সেই যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম স্পষ্ট ধরা পড়িল যে, রাশিয়ার আর্থিক বনিয়াদ একেবারে বালুকার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই রাশিয়ায় নব-যুগের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিন সেই বনিয়াদকেই সুদৃঢ় করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিয়াছিলেন; আর বর্ত্তমান সোভিয়েট গভর্ণমেন্টও লেনিনের সেই নীতি অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (Five Year Plan) ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

রাশিয়ায় জারের শাসন শেষ হইয়া নূতন শাসন ব্যবস্থা যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন প্রথম তিন-চারি বৎসর রাশিয়াকে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহার ফলে, উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি সক্রিয়-ভাবে এই বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সুতরাং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাশিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য তাহারা তাহাদের অঙ্গুলীমাত্রও উত্তোলন করিল না। বরং তাহারা সমবেতভাবে ধনিকতন্ত্রের বিরোধী এই নব জাগ্রত বিপ্লবী রাশিয়াকে অনাহারে হত্যা করিবার জন্যই সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যে দেশ একবার জার-তন্ত্রের কঠিন নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, অন্তর্বিপ্লব পদদলিত করিয়া যে দেশ একবার উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা যে বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রে অবনত হইয়া পড়িবে, সেরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

ফরাসী বিপ্লবের পরেও সুসভ্য ইংলণ্ডের নেতৃত্বে একবার এইরূপ হীন ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হইয়াছিল; রাশিয়ার বিপ্লবী গভর্ণমেণ্টের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কিছু-মাত্র বিপর্য্যস্ত না হইয়া, অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি এবং বিস্ময়কর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান লইয়া শত্রুপক্ষের হীন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিপ্লবী রাশিয়াকে ক্রমাগত বহিঃশত্রু,

গৃহশত্রু ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়িতে হইয়াছিল, পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা এক অতুলনীয় অধ্যায়। বাধার পর বাধা, চতুর্দ্দিকে বাধা, এমন কি লেনিনের অন্যতম সহকর্ম্মী ট্রটস্কী পর্য্যন্ত তাহার ভাব-বিলাসী অনুচরদিগের সহায়তায় যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা লৌহ-কঠোর ও দুর্লঙ্ঘ্য মনে হইলেও শক্তিশালী লেনিনের যুক্তি ও অটল অধ্যবসায়েব বলে, অন্তর্হিত হইয়া গেল! পরিণামে লেনিনের পবিকল্পনাই জয়যুক্ত হইল—ষ্ট্যালিন প্রভৃতি বিশ্বস্ত সহকর্ম্মিগণ তাহা সমর্থন করিলেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হইল।

কাজ সুরু হইল বটে, কিন্তু বিপদ্ আসিল অন্যদিক্ হইতে। রাশিযাব নবজাগ্রত গভর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন; ছোট-বড় বিভেদের গণ্ডী ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী সম্প্রদায়েব অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারাই হইল নবগঠিত সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। তাহারা এই সরকারেব সহিত সম্পূর্ণ ভাবে অসহযোগিতা আরম্ভ করিল। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রা প্রায় অচল হইয়া পড়িল।

রাশিয়াব সদ্যোভূমিষ্ঠ নূতন গভর্ণমেণ্টের এই সঙ্কটকালেও তীক্ষ্ণধী লেনিনের বুদ্ধি ও ব্যবস্থা জয়ী হইল। তিনি New Economic Policy, সংক্ষেপে N. E. P. অর্থাৎ নূতন অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করিয়া শিশু-গভর্ণমেণ্টকে মারাত্মক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন।

এই নূতন নীতির ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কিছু কিছু স্বীকার করা হইল বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখা হইল ব্যবসায়িগণ যেন অতিরিক্ত মুনাফা করিয়া বিপ্লবের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া না দেয়। এইজন্য ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ নীতিও প্রযুক্ত হইল। এইভাবে সরকারী কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টি রাখার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবসায়িগণ শোষণ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিল না—তাহাদের সমস্ত উদ্যম ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল।

লেনিনকে অবশ্য এই নীতি প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। দেশী ও বিদেশী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের ব্যাপক বিরুদ্ধ-প্রচার-কার্য্য ও অসংখ্য বাধা লেনিনকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ এমন কথাও প্রচার করিয়াছিল যে, লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া ধনিকতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে,—তাঁহার কথিত সমাজতন্ত্রবাদ একটা বিরাট ধাপ্পা মাত্র।

প্রসঙ্গতঃ, এইখানে তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটা শোচনীয় অধ্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুনাফাখোর ও ব্যবসায়িগণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে নাই। তাহার ফলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে একমাত্র বাংলাদেশেই পনেরো লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে পার্থক্য এইখানে যে, সেখানকার গভর্ণমেণ্ট মুনাফাখোরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই।

যাহা হউক্, 'নেপ্' নীতি (N.E.P.) প্রচলন করিয়া লেনিন বাধা-বিঘ্ন দূরীকরণে সমর্থ হইলেন, এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তিনি তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করিলেন। এই মহাকার্য্য সাধনে বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

বস্তুতঃ লেনিন তাঁহার সমাজতন্ত্র বা Socialism এর জন্য বিশেষভাবে Electricity'র মূল্য হৃদয়ংগম করিয়াছিলেন। জনৈক ব্যক্তি লেনিনকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সোশ্যালিজমের অর্থ কি?" ইহার উত্তরে লেনিন বলিয়াছিলেন, "Socialism means electrification of Russia."

একটু চিন্তা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তৃত প্রয়োগই সোভিয়েট-রাশিয়ার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ। দেশের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য শিল্প আবশ্যক। আর শিল্পের জন্য আবশ্যক বিদ্যুৎ ব্যবহার। সুতরাং লেনিন তাঁহার 'নেপ্' নীতি (N.E.P.) এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার-নীতি, এই উভয় নীতির সহযোগে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তাহার সহজ ও স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করিলেন।

মহামতি লেনিন জীবিত থাকিলে হয়ত তাঁহার নব নব চিন্তাধারা রাশিয়ার কল্যাণে আরও নিয়োজিত হইতে পারিত; কিন্তু কল্যাণের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ১৯২৪ সালের

২১শে জানুয়ারী তারিখে, অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকায় তিনি অমর-লোকে প্রস্থান করিলেন।

লেনিন অন্তর্হিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু রাশিয়াকে তিনি অসহায় অবস্থায় কিংবা দুর্ব্বল বা অযোগ্য হস্তে ফেলিয়া যান নাই। রাশিয়ার জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পুরুষসিংহ কমরেড্ ষ্টালিন এবং একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) রাখিয়া গিয়াছেন। কমরেড্ ষ্টালিন্ যে অপূর্ব্ব যোগ্যতার সহিত লেনিনের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, রাশিয়ার ছাব্বিশ বৎসরের ইতিহাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লেনিনের তিরোধান হইলে, ষ্টালিন তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই, দেশের কোথায় কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার একটা হিসাব গ্রহণ করিলেন। হিসাব গ্রহণের সময় কোন স্থানকেই তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন নাই; দেশের কল্যাণে সকলেরই প্রয়োজন আছে ইহা ভাবিয়া, তিনি সমভাবে সর্ব্বত্রই জরীপের (Survey) ব্যবস্থা করিলেন।

যে সকল খনিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন হইত, ষ্টালিন সে সকল স্থলে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন। রাশিয়ায় সম্রাটের শাসন-কালে মৃত্তিকা-পরীক্ষা ও খনি আবিষ্কারের জন্য ভূবিদ্যা-বিশারদদিগকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হইত, ষ্টালিন তাহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন।

তাঁহার প্রেরণায়, রাশিয়ার দিকে দিকে সামরিক অভিযানের ন্যায় বৈজ্ঞানিকের দল ছড়াইয়া পড়িল—সমগ্র দেশে একটা নব জাগরণের সাড়া ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

এই প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়ার বহু অঞ্চলে রাসায়নিক দ্রব্য, বিবিধ ধাতু ও তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন্ জমিতে কিরূপ কৃষি উৎকৃষ্ট হইবে, গবেষণা করিয়া তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হইবে তাহারও তিনটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া, সেই অনুসারে কাজ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে চারি বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই সকল জনহিতকর কার্য্যে যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সংগ্রহের জন্য রাশিয়াকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে কোন বৈদেশিক শক্তির দ্বারস্থ হইতে হয় নাই; অপরের সাহায্য বা অপরের সহানুভূতি সে প্রার্থনা করে নাই, সে কেবল সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বীর ন্যায় নিজের ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিয়াছে। দেশের লোকেরাই নানারকম কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র অংশ হইতে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়াছে, এবং তাহাতেই মূলধন গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই অর্থনৈতিক সংগ্রামে রুশ-জনসাধারণের ত্যাগ-স্বীকার অতুলনীয়। নব-গঠিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে রাষ্ট্র-

নায়কদিগের যাবতীয় নির্দ্দেশ পালন করিতে যাইয়া তাহাদিগকে ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করিয়া আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইয়াছে; সুকোমল চর্ম্ম-পাদুকার পরিবর্ত্তে কঠিন কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের এই দুঃখ বরণ তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত—তাহারা হাসি-মুখে এই দুঃসহ দুঃখকে তখন বরণ করিয়া লইয়াছিল। কারণ, তাহারা জানিত যে, অপরের দাসত্ব তাহারা করে না—অপরের নির্দ্দেশ তাহারা মাথায় তুলিয়া লয় নাই! বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন একটা জাতির ন্যায় সগর্ব্বে উচ্চশিরে তাহারা নিজেদের নির্দ্দেশই পালন করিতেছে।

সেদিন তাহারা মনেপ্রাণে এই দৃঢ় বিশ্বাসই পোষণ করিয়া-ছিল যে, এই কৃচ্ছ্র-সাধন একদিন তাহাদের শেষ হইয়া যাইবে, এবং ইহার সুফল একদিন তাহারা ভোগ করিবেই। এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই সেদিন তাহারা সারা দেশব্যাপী এক কঠোর সাধনা করিতে পারিয়াছিল।

প্রতি পাঁচবৎসর অন্তে তাহারা যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পরিকল্পনা-গুলির বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথম পাঁচবৎসরে যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, দ্বিতীয় পাঁচবৎসরে তাহার বহুশত কোটি রুবল (রাশিয়ার মুদ্রা-বিশেষ) অধিক ব্যয় হইয়াছে; আর পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে তাহারও শতগুণ অধিক অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, সারা দে[illegible]কে শিক্ষিত করিবার জন্য, একটা

বিরাট দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীকে মানুষ করিবার জন্য, সেখানে যেন একটা প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছিল এবং আজও তাহার গতিবেগ অক্ষুন্নই রহিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় পদার্পণ করিয়াই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ব্যথিত চিত্তে সেদিন তিনি সেদেশ ও এদেশের তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "একশো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ। (এখানে) শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায় তার প্রবলতায়।"

তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মর্ম্মভেদী কণ্ঠে সেদিন বিশ্বকবি ঘোষণা করিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদেব ঘৃণার দ্বারা ধিক্কৃত।"

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টেব আদর্শ আজ যেন সমগ্র বিশ্বে একটা সুদৃঢ় মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে! আজ কী ধনিক, কী শ্রমিক, সকল দেশের গভর্ণমেণ্টই পরিকল্পনা করিয়া দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্দ্ধারণ কবিতে উন্মুখ! ইহা যেন আজ একটি বিশ্বজনীন ব্যাপাবে পরিণত হইয়াছে। রাশিয়া আজ সকলেবই পথ প্রদর্শক।

রাশিয়ার ন্যায় অন্যান্য দেশগুলিও নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সেই পরিকল্পনা-গুলির মূলে নিহিত আছে সর্ব্বগ্রাসী শোষণের রাক্ষসী-নীতি। কাজেই তাহাতে পৃথিবীর কোন কল্যাণ-সাধন করা তো দূরের

কথা, সারা পৃথিবীতে তাহা দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেবল বিদ্বেষ ও সজ্ঘর্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে, জগতে আজ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন ফলই প্রসূত হইতে পারে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইটালী, জার্ম্মাণী ও জাপান এই-ভাবেই আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা করিয়াছিল। আমেরিকার স্বর্গগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইহার ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা আপোষ-মূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে তাঁহার উদ্ভাবিত New Dealএর আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অথচ সুনির্দ্দিষ্ট পরি-কল্পনা অনুসারে কাজ করিয়া রাশিয়া যে কি পরিমাণে সুফল লাভ করিয়াছে, আশা করি তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১৯৩০ সালে রাশিয়ার তৈলখনি হইতে তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল এক কোটি টন; কিন্তু মাত্র দশ বৎসর পর, ১৯৪০ সালে তাহার উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ হইয়াছিল চতুর্গুণ। রাশিয়া এইরূপে তাহার যাবতীয় শিল্পেরই উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলে, শিল্প-জগতের প্রতিযোগিতায় রাশিয়া আজ কোন কোন ক্ষেত্রে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে,

আর কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার স্থান দ্বিতীয় কিংবা অতুল্য। কাজেই এখন আর তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না—রাশিয়া এখন স্বাবলম্বী।

আধুনিক রাশিয়ার এই গৌরবময় উন্নতির কারণ কি? ইহা কি কেবল তাহার সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে?—না, তাহা নহে। রাশিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ—তাহার 'ষ্ট্যাখানোভাইট্' আন্দোলন।

এই আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক—কমরেড্ ষ্ট্যাখানোভাইট্। তাঁহারই নাম অনুসারে আন্দোলনের এই আখ্যা হইয়াছে। কি উপায়ে খনিজ ও যাবতীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, তাহারই গবেষণা ছিল এই আন্দোলনের

কমরেড্ ষ্ট্যাখানোভাইট্ রাশিয়ার উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য রাশিয়ার যাবতীয় শিল্পকেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় ও উৎসাহে শ্রমিকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়; তখন প্রত্যেকটি শ্রমিক উৎপাদন-বৃদ্ধিকল্পে নিত্য-নূতন উপায় আবিষ্কারের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে।

এই নূতন আন্দোলনে রাশিয়ার নব-গঠিত রাষ্ট্রনায়কগণও অলস রহিলেন না। তাঁহারা পরিপূর্ণ সহযোগিতার মনোবৃত্তি লইয়া সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন,—প্রত্যেকটি কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীর ছা[illegible]গুলী বৈজ্ঞানিক শিক্ষার

শোণিত-ধারায় পুষ্ট ও সতেজ হইয়া উঠিল—বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশে সকলই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তদুপরি উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাত অনুসারে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রনায়কগণ যাবতীয় শ্রমিকদিগের হৃদয়ে এক প্রবল প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিলেন।

ইহাতে এক বিস্ময়কর ফল প্রসূত হইল। রাশিয়ার শ্রমিকগণ ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র দেখিতে পাইল, এবং ক্রমশঃ তাহারা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নেতৃত্বপদ লাভের যোগ্যতাও অর্জ্জন করিল। রাশিয়ার বহু শ্রমিক এখন নেতা হইবার উপযুক্ত।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে হিট্‌লার প্রমুখ নাৎসী নেতাগণ, এমন কি মিত্রপক্ষের নেতাগণও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, সমরায়োজন ও শিল্পকার্য্যে রাশিয়া এতদূর উন্নতি-সাধন করিয়াছে। গ্রেট্ ব্রিটেন ও আমেরিকা যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল না, সাহায্য করিবার কথা ছিল বহু পূর্ব্বেই। তথাপি সাহায্য প্রদানে যে বিলম্ব হইয়াছিল তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাহারা ভাবিয়াছিল, রাশিয়া নিশ্চয়ই জার্ম্মাণীর নিকট পরাজিত হইবে। কিন্তু রাশিয়া পরাজিত হওয়া দূরের কথা, রাশিয়াই তাহাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে।

রাশিয়ার খ্যাতি ও বীরত্ব আজ কেবল রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ নহে—তাহা আজ সুদূরপ্রসারী। রাশিয়া আজ পৃথিবীর দুইটি

বিশিষ্ট শক্তির অন্যতম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া, এই দুইটি শক্তিই আজ সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

কৃষি বিষয়েও রাশিয়ার উন্নতি এক অতুলনীয় ও অভাবনীয় ব্যাপার! নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাশিয়া তাহাতে যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বিপ্লবের পর, রাশিয়ায় নব-জাগরণের উন্মেষকালে লেনিন্, ষ্ট্যালিন প্রভৃতি বলশেভিক রাষ্ট্রনায়কগণ দেখিলেন যে, তাহাদের যাবতীয় সমস্যা মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক,—রাজনৈতিক নহে। সুতরাং তাঁহারা তখনই ধারণা করিয়া লইলেন যে, তাঁহাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে পারিলেই তাঁহারা বিশ্বের রাজনৈতিক দরবারেও উচ্চ আসনের অধিকারী হইতে পারিবেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্বদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাদের সমগ্র শক্তি তাহাতেই নিয়োজিত করিলেন।

শিল্প-জগতে তখনও রাশিয়ার স্থান ছিল অতি নগণ্য; কিন্তু শিল্পের যাহা প্রধান উপকরণ, সেই কাঁচামালের ঐশ্বর্য্যে রাশিয়া চিরদিনই সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। জারের শাসনাধীন কাল হইতেই রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং কাঁচামাল ছিল তাহার অপর্য্যাপ্ত। লেনিন ইহা লক্ষ্য করিলেন। শুধু ইহাই নহে; তিনি আরও দেখিলেন, শিল্পোন্নতির উপযোগী প্রচুর মূলধন তাঁহাদের নাই, [illegible]পদের মধ্যে একমাত্র

কাঁচামাল। সর্ব্বাগ্রে তাই তিনি তাঁহাদের নিজস্ব ঐশ্বর্য্য কৃষির দিকেই মনোনিবেশ করিলেন।

লেনিন জানিতেন, রাশিয়ার শিল্প-প্রসারের উদ্যমে পৃথিবীর আর কেহই তাহাকে সাহায্য করিবে না, কেহই তাহাকে মূলধন সরবরাহ করিবে না,—যদি কিছু করিতে হয়, রাশিয়াকে তাহার নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াই করিতে হইবে। সুতরাং কৃষি-প্রধান রাশিয়ার পক্ষে কৃষিকার্য্যের দিকে মনোনিবেশ ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে? তারপর অন্য কারণও ছিল।

লেনিন জানিতেন, পৃথিবীর অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশ, —বিশেষভাবে জার্ম্মানী, কৃষিজাত কাঁচা মালের জন্য রাশিয়ার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। সুতরাং রাশিয়া যদি তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত কাঁচামাল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই কাঁচামালের বিক্রয়লব্ধ অর্থেই তাহার শিল্প-বাণিজ্যের উপযোগী মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লেনিন প্রচলিত কৃষি-ব্যবস্থার এরূপ উন্নতি সাধন করিলেন যে, অচিরেই তাঁহার পরিকল্পনা আশাতিরিক্ত ফল প্রসব করিল।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-ব্যবস্থা ভাগ্য-সাপেক্ষ। জারের আমলে রাশিয়ার অবস্থাও সেইরূপই ছিল। চাষীরা বীজ পুঁতিয়া প্রকৃতির দয়ার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত। সুতরাং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনেকাংশে 'লটারী'

বা ভাগ্য পরীক্ষার ন্যায় মনে হইত। কিন্তু নব-গঠিত রাশিয়ার কর্ণধারগণ ইহার আমূল পরিবর্তনের প্রয়াসী হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল যে, যান্ত্রিক যুগে বাস করিয়া যন্ত্রের ব্যবহার না করিলে তাহা প্রকাণ্ড অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে, এবং চির-ঈপ্সিত সমাজতন্ত্রবাদ মতবাদ হিসাবেই থাকিয়া যাইবে, তাহা কখনও পরাধীন, শাসন-পীড়িত, শোষিত ও লাঞ্ছিত জনগণের সম্মুখে মরূদ্যানের বাস্তব রূপ ধারণ করিয়া কল্যাণের উৎস খুলিয়া দিবে না। কাজেই তাঁহারা উন্নত প্রণালীর কৃষি-ব্যবস্থার জন্য অন্যান্য দেশসমূহের 'টেক্‌নিক্' (Technique) অবলম্বন করিলেন।

কেবল তাহাই নহে; তাঁহারা ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভূমি-ব্যবস্থার (Fragmentation of land) আমূল পরিবর্তন করিয়া সেখানে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা (Collectivisation of agriculture) প্রবর্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উন্নত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের হার অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি করিলেন।

এই ব্যাপারে ষ্ট্যালিনের কৃতিত্ব সর্বাধিক, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সাফল্য যাদুবিদ্যার ফল নহে, এবং ইহা রাতারাতিও সম্ভব হয় নাই। কারণ, আমাদের দেশীয় কৃষক-দের ন্যায় রাশিয়ার কৃষকগণও তখন অজ্ঞতার নিম্নতম পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল। সুতরাং তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করা খুব সহজ

ছিল না। এমন কি, বড় বড় কৃষকদের নেতৃত্বে এখানে-সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহাগ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে; আর রাশিয়ার নবগঠিত গভর্ণমেণ্টকে সেই সকল বিদ্রোহ দমন করিতে নিতান্ত কম বেগ পাইতে হয় নাই।

পুরুষদিগকে সম্মত করাইতে পারিলেও নারীদিগকে এই যৌথ কৃষি-ব্যবস্থায় সম্মত করাইতে খুবই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এখন অবশ্য এক পাড়ার বা এক গ্রামের মেয়েরা মিলিত হইয়া স্ব-স্ব জমির পরিমাণ অনুসারে শ্রম করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করা কি সহজ?

সুখের বিষয়, রাশিয়ার নবগঠিত গভর্ণমেণ্টকে যত বাধা-বিঘ্নেরই সম্মুখীন হইতে হউক না কেন, তাহাদের তুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন সেখানে সমগ্র দেশের জমি চাষীদের নিজস্ব সম্পত্তি। সারা দেশে যেখানে যত কৃষিক্ষেত্র ছিল, দেশের সেই সমস্ত জমি সেদেশের কৃষকদিগকে তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং সমবায়-পদ্ধতিতে (Co-operative way) চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের বলে এতদিন যাহারা ধনী কৃষকরূপে পরিগণিত ছিল, তাহারা এই সাম্যমন্ত্রের পূজারী গভর্ণমেণ্ট ও তাহাদের কর্ণধারগণকে এত সহজেই মানিয়া লইবে কেন? তাহারা পদে পদে বাধা দান করিয়াছে। এবং রাশিয়ার নবগঠিত গভর্ণমেণ্টকে পূর্ব্ব মালিকগণের বিরুদ্ধে অনবরতই লড়াই করিতে হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, রাশিয়ার চাষীরা এতদিন একভাবে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা তাহাতে এক আমূল পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় তাহারাও যেন অনেকটা অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া গেল! সুতরাং নূতন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করাইবার জন্য তাহাদিগকে তদনুরূপ শিক্ষিত করার প্রয়োজন হইল। হিংসা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভ্রাতৃভাবে অণুপ্রাণিত করিবার জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতে হইল। লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা ও প্রাচীর-পত্র বিতরণ করিয়া, অসংখ্য সভা-সমিতির অধিবেশন করিয়া, কৃষকদিগকে রাশিয়ার নূতন নীতির সঙ্গে পরিচিত করিতে হইল।

কিন্তু কেবল বক্তৃতা ও প্রচার-পত্রে কোন আদর্শ কার্য্যকরী হয় না। তজ্জন্য বাস্তব উদাহরণেরও আবশ্যক হইল। সেই উদ্দেশ্যে সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থানে স্থানে নয়া কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল এবং এইভাবে কৃষকদিগকে নূতন পদ্ধতির কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করান হইল। মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ এ বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছু বলিয়া যান নাই, তাঁহারা মাত্র আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ষ্ট্যালিন যে বাস্তব আদর্শের প্রবর্ত্তন করিয়া রাশিয়ার কৃষকদিগের সম্মুখে এক নবযুগের সৃষ্টি করিলেন, ইহাতে তাঁহার জয়-গৌরব শত কণ্ঠে বিঘোষিত হইল,—আর এইখানেই ষ্ট্যালিনের বৈশিষ্ট্য।

রাশিয়ার কথা বলিতে গেলে প্রসঙ্গতঃ ভারতবর্ষের কথাও আসিয়া পড়ে। ভারতের কৃষি ও শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বর্ত্তমানে

দুইটি পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে একটির রচয়িতা টাটা, বিড়লা প্রভৃতি আট জন ধনকুবের; আর অপরটির রচয়িতা ভারতীয় মজদুর-সঙ্ঘ। প্রথমটির নাম 'বোম্বাই প্ল্যান্' আর দ্বিতীয়টার নাম 'পিপল্স্ প্লান', অর্থাৎ জনগণের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

শেষোক্ত পরিকল্পনা অনেকাংশে রাশিয়ার পরিকল্পনার অনুরূপ। ইহাতে কৃষিকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে; কিন্তু প্রথমোক্ত পরিকল্পনা ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাতে শিল্পের স্থান সর্ব্বোচ্চে।

এই উভয় পরিকল্পনার মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থাও পরস্পর বিপরীত। 'বোম্বাই প্ল্যান্' বা প্রথমোক্ত পরিকল্পনায় বিদেশ হইতে ধার করিয়া প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু 'পিপল্স্ প্ল্যান্' বা শেষোক্ত পরিকল্পনা বৈদেশিক মূলধনের অনুমোদন করে নাই, মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা তাহাতে সর্ব্বাংশে রাশিয়ার অনুরূপ। এই পরিকল্পনার রচয়িতাগণ বলেন যে, রাশিয়ার মত কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসলের বিক্রয়-লব্ধ অর্থে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে।

উভয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপ হারে নির্ণীত হইয়াছে, তাহাও বলিতেছি।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের হার হইবে ১৯৩৯ সালের হার অপেক্ষা শতকরা ১৩০ ভাগ বেশী, কিন্তু শিল্পদ্রব্যের হার

হইবে শতকরা ৪০০ ভাগ বেশী। আর ইহাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১৫ বৎসরে দশ হাজার কোটী টাকা।

শেষোক্ত পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১০ বৎসরে ১৫ হাজার কোটী টাকা, আর উৎপাদনের হার ও গতি হইবে সর্ব্বাংশে প্রগতিমূলক। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৪০০ ভাগ বেশী এবং শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৬০০ ভাগ বেশী করিতে হইবে।

শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুমোদন ইহাতে আছে বটে, কিন্তু তদুপযোগী মূলধনের জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। রাশিয়ায় এইরূপ পরিকল্পনা সফল হইয়াছিল ; কাজেই অনেকের বিশ্বাস, ভারতেও তাহা সফল হইতে বাধ্য। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, রাশিয়ায় তাহা সফল হইয়াছিল এই জন্য যে, রাষ্ট্র-ক্ষমতা সেখানে কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের হাতে। আমাদের রাষ্ট্র-ক্ষমতাও যদি সেইরূপ শতকরা ৯৫ জন শোষিতের হাতে আসে, কেবল তাহা হইলেই এই পরিকল্পনার সাফল্যের আশা করা যাইতে পারে,—নতুবা নহে।

ভারতবর্ষের প্রচলিত গভর্ণমেণ্ট দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদী স্বার্থের রক্ষক মাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষেত্রে যাহারা প্রতিপত্তিশালী, তাহারা কিছুতেই ইহার আমূল পরিবর্ত্তনে সম্মত হইবে না।

আমাদের দেশী এবং বিদেশী ধনিকশ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? ভারতীয় ধনিকও বিদেশী এবং বিলাতী পুঁজিওয়ালা-দেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদেরই সহযোগিতায় ইহারা দেশের শিল্প-বাণিজ্য সংগঠনে অগ্রসর হন। ইহার ফলে কতিপয় ধনিকই ক্রমশঃ ঐশ্বর্য্যে স্ফীতোদর হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু দেশের যাহারা জনসাধারণ, তাহারা ক্রমশঃ দারিদ্র্যের নিম্নতম অন্ধকার পঙ্কমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছে। এক কথায়, দারিদ্র্য ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতিই এইরূপ। ইহা একদিকে যেমন মুষ্টিমেয়ের সুখ-সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে, অপর দিকে সেইরূপ সমাজের একটা বৃহৎ অংশের দুর্দ্দশার কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

রাশিয়ার কৃষির উন্নতি সাধনে ষ্টালিন যাহা করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার এই কীর্ত্তি অপর যাবতীয় কীর্ত্তিকে ম্লান করিয়াছে। রাশিয়া এক বিরাট দেশ; অসংখ্য জাতি ও ধর্ম্ম তাহাকে জটিল ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। এরূপ পরিবেশের মধ্যেও তিনি যে অতুলনীয় অধ্যবসায় ও উৎসাহ-সহকারে রাশিয়ার কৃষি-ব্যবস্থায় যুগান্তর সাধন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

পিতা যেমন তাঁহার অবাধ্য সন্তানকে কখনও স্নেহে, কখনও তিরস্কারে, কখনও বা কঠোর শাসনে ক্রমশঃ সুপথে পরিচালিত করিয়া থাকেন, মহামতি ষ্ট্যালিনও সেইরূপ তাঁহার স্বদেশীয়

কৃষকদিগকে গতানুগতিকতা ও কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যৌথ-ব্যবস্থার সারবত্তা বুঝাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইযাছেন।

ষ্ট্যালিনের এই শুভ প্রচেষ্টায় বাধা-বিঘ্ন বহু আসিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে তাঁহার সদিচ্ছাই জয়যুক্ত হইয়াছে। আজ গ্রাম্য কৃষক এবং কৃষক-রমণীও যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "রাশিয়ার চিঠিতে" বলিয়াছেন "...মধ্য-এশিয়ার Baskhir Republic এর একজন চাষী বললে, আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে কিন্তু নিকটবর্ত্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেবো। কেন না, দেখেছি, স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই,—ছোটো ক্ষেতের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলেনা। তা ছাড়া, আমাদের টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।"

সাইবেরিয়ার এক কৃষক-রমণীও সেদিন কবিগুরুকে বলিয়াছিল, "ঐকত্রিক দলের চাষী-মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্য প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশু-পালনাবাস, শিশু-বিদ্যালয় আর সাধারণ পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে।"

মোটকথা, লেনিন ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও সহকর্ম্মী ষ্ট্যালিনের কৃতিত্বে রাশিয়ার দিকে দিকে আজ উন্নতির বৈজয়ন্তী

উড্ডীয়মান! সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতি যেন কর্ম্ম-কুশলতায় সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে! শোষণ, নিষ্পেষণ, অলসতা, দারিদ্র্য সারা দেশ হইতে যেন চির-বিদায় লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার সেই অপরূপ পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন:—"মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেচে। কেউ ফিটফাট নয়। দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্দ্ধান করেচে, সকলেরই স্বহস্তে কাজ কর্ম্ম ক'রে দিনপাত করতে হয়, বাবু-গিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই।"

পৃথিবীর কোন দেশেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির রাতারাতি উন্নতি হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, তথাপি শিক্ষার কোন উন্নতি সাধনই সম্ভবপর হইবে না!

শিক্ষার প্রসার ও গতি-বৃদ্ধি সম্পর্কে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লোকের যে ধারণা ছিল, আজ সোভিয়েট্ রাশিয়ার আদর্শে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অতীতে অনেকেরই ধারণা ছিল, কূর্ম্ম-গতিতেই শিক্ষার প্রসার সম্ভবপর। কিন্তু শত শত বৎসর যাবৎ সুদীর্ঘ জার-শাসনেও যাহা সম্ভবপর হয় নাই, মাত্র ২৫।৩০ বৎসরে সোভিয়েট রাশিয়া তাহাই সম্ভবপর করিয়াছে।

সম্রাট্ বা জারের শাসন-কালে রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ ও কৃপণ ছিল। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র চিরদিনই জন-সাধারণের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ও শিক্ষার উন্নতি অত্যন্ত ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাশিয়াতেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জারতন্ত্র সেখানে স্পষ্টই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং আনুষঙ্গিক কুসংস্কার ও জড়তাই ছিল তাহার একমাত্র মূলধন। জনসাধারণ যদি জ্ঞানলাভ করিয়া নিজেদের দুরবস্থা সম্পর্কে সম্যক্ চেতনা লাভ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই অত্যাচারী রাজবংশের হাত হইতে রাজদণ্ড খসিয়া পড়িবে।

একদিকে অশিক্ষা ও অপর দিকে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা-চালিত ভেদবুদ্ধির কুশিক্ষা, এই উভয় স্তম্ভের উপরেই রাশিয়ার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল; ইহা রাজশক্তিও বিলক্ষণ জানিতেন; সুতরাং তাঁহারা চিরদিনই ইহাদের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই মুষ্টিমেয় কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন তৎকালে আর কেহই শিক্ষার সিংহ-দ্বারে পৌঁছিতে পারিত না।

সুদীর্ঘকাল রাশিয়া এইভাবেই চলিল; কিন্তু অবশেষে প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না—রাশিয়ার শিক্ষাবিধির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

মহামতি লেনিন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কৃষি ও শিল্পোন্নতির জন্য যেমন বিস্তৃত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করা আবশ্যক, জন-

সাধারণের অজ্ঞতা এবং জড়তা দূর করিবার জন্যও সেইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু পুরাতন গতানুগতিক পন্থায় শিক্ষাদান ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং বিপ্লবের মাঙ্গলিক রসে স্নিগ্ধ করিয়া জাতির ঊষর বক্ষে যথার্থ শিক্ষা দান আবশ্যক, ইহা তিনি স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, কৃষি ও শিল্পের বিরাট পরিকল্পনাকে সার্থক ও কার্য্যকরী করিতে হইলেও শিক্ষা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিবামাত্র তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"র আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

লেনিনের সেদিনের সেই উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া অপরাপর বৈদেশিক শক্তি কত বিদ্রূপই না করিয়াছিল! কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়া সেদিন বলিয়াছিলেন, "রাশিয়া আবার সভ্য হইবে!" এমনকি বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া রাশিয়ার সামরিক যোগ্যতা সম্পর্কে কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "কৃষি-প্রধান দেশের অধিবাসী চাষাভূষো— তারা আবার যুদ্ধ করবে কি! তাদের না আছে সেনাপতি, না আছে কোন সামরিক শিক্ষা!"

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, সামরিক প্রতিযোগিতায় মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রাশিয়া যে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে পৃথিবীর অপরাপর বৃহৎ শক্তিগুলি ম্লান ও নিষ্প্রভ

হইয়া গিয়াছে! বস্তুতঃ রাশিয়া যে বর্তমান জগতের অন্যতম বৃহৎ শক্তিরূপে এক অপূর্ব্ব গৌরবময় ভবিষ্যতের অধিকারী, ইহা আজ তাহার শত্রু-মিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে!

কেবল তাহাই নহে। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি এখন এতই সাফল্য-মণ্ডিত ও সুদূরপ্রসারী যে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯২টি শ্রমিক সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়া সে তাহার তিন কোটী অধিবাসীকে কল-কারখানার কাজে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই এখন রীতিমত নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজে যোগদান করে এবং কোন্ কলের কোন্ অংশে কিরূপ কাজ হয়, তাহাও বুঝিতে পারে। মোট কথা, কল-কারখানার কাজে তাহারা এখন এতই অভিজ্ঞ যে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই একটা পূর্ণাঙ্গ কারখানার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ। এক কথায়, মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার স্তর হইতে তাহারা এখন নূতন এক ঐতিহাসিক যুগের নূতন মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

কেহ কেহ কেবল ভাষাজ্ঞানের মাপকাঠিতেই শিক্ষার উন্নতি-অবনতি পরিমাপ করিবার প্রয়াসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মাপকাঠি কখনও ভাষাজ্ঞান নহে। সামাজিক মানুষের সর্ব্ববিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা যে ভাষা ও সাহিত্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই ভাষা ও সাহিত্যই আজ রাশিয়ার অধিবাসীদের অন্তরের ভাষা! ভাষা সজীব প্রাণরসের

প্রাচুর্য্যে সরস ও সমৃদ্ধ হইয়া এবং সম্ভাবনাময় অপূর্ব্ব বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া, রাশিয়ার দিকে দিকে জীবনের ফোয়ারা ছুটাইয়াছে! আজ সমাজ ও জাতিগঠনের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার বাহন সেই ভাষা। মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে জ্ঞান ও নীতিধর্ম্ম বীজাকারে নিহিত আছে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া মানুষকে জীবন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য শক্তিদান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। রাশিয়ার কর্ণধারগণ এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন; সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাদিগকে এক নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আর তাহারই ফলে রাশিয়ার শিক্ষা আজ সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ, রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাত্র কয়েক বৎসর পরেই, কবি রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গমন করিয়াছিলেন, রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা তখনই বিস্ময়কর প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। ইহা দেখিয়াই কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন:—

"রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে, সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে।"

যে রাশিয়া একদিন ধর্ম্মগত ও প্রদেশগত সঙ্কীর্ণ বিভেদের জন্য ভ্রাতৃত্বের মর্য্যাদাশূন্য একতাহীন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়া গৃহ-বিবাদে নিরত ছিল, আজ সেই দেশ—সেই রাশিয়াই

একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার (Right kind of education) ফলে এখন একতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র রাশিয়া কমরেড্ ষ্ট্যালিনের নির্দ্দেশে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

রাশিয়ার নাগরিকগণ সকলেই যাহাতে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের কল-কারখানা ও আফিসের কার্য্যকাল হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমরকালীন অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যতীত অন্য সময় কাহাকেও দৈনিক ছয় ঘণ্টার বেশী খাটিতে হয় না, সুতরাং তাহারা প্রচুর অবসর পাইয়া থাকে। সেই অবসরকাল তাহারা সরকারী খরচে স্ব-স্ব অভিপ্রায় ও রুচি অনুযায়ী লেখাপড়া, আমোদ-প্রমোদ, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতে পারে। ইহার ফলে তাহাদের কর্ম্মপটুতা সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, কর্ম্মপটু ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ৪।৫ ঘণ্টা কাজ করিলেই যথেষ্ট—ইহার বেশী প্রয়োজন হয় না।

কাহাকেও কর্ম্মপটু করিতে হইলে তাহার যে দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার আবশ্যক, রাশিয়া তাহা প্রদানে একেবারেই কৃপণ ও পরাঙ্মুখ নহে। দৈহিক চিকিৎসা করেন ডাক্তার, আর মানসিক চিকিৎসা করেন শিক্ষক। রাশিয়ার কর্ণধারগণ তাঁহাদের স্বদেশবাসীদিগের জন্য এই দ্বিবিধ চিকিৎসারই বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে, তাহারা সকলেই শিক্ষিত ও কর্ম্মকুশল হইয়া দেশ ও জাতির

গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। অল্প সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ বিবিধ সংক্ষিপ্ত ও প্রকৃষ্ট পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন।

তরুণ বালকগণ ও কল-কারখানায় কাজ করে বটে, কিন্তু তাহাদের দৈনিক কার্য্যকাল অতি সামান্য। কিছুক্ষণ কাজ করিবার পরই তাহারা ছুটী পায়। কিন্তু সেই অবসর-কাল তাহাদিগকে বৃথা নষ্ট করিতে দেওয়া হয় না। তাহারা সেই সময় ভ্রমণে বাহির হয়, এবং বক্তৃতার অনুশীলন, গান অথবা নাট্যাভিনয় করে।

বিদ্যাচর্চ্চাকেও তাহারা জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। জার-শাসনের আমলে নিতান্ত ভাগ্যবান্ মুষ্টিমেয় ধনীর সন্তান ব্যতীত অপর কেহই বিদ্যার্জ্জনের সুযোগই পাইত না—বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র তাঁহাদের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আমলে, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, সকলের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অবৈতনিক ও উন্মুক্ত।

আধুনিক শিক্ষাবিধিও যুগোপযোগী এবং যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন। রাশিয়ার বুকের উপর দিয়া যে বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, স্কুলে তরুণ বালকদিগকে তাহাদের জীবনের প্রারম্ভেই সেই বিপ্লবের আদর্শ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা যাহাতে Civics, Politics, Economics প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়া আধুনিক জগতে উন্নত মস্তকে

কণ্ঠায়মান হইতে পারে, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন লওয়া হয়। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা কিংবা জাতিভেদ-মূলক সমাজ-ব্যবস্থার কোথায় যে ত্রুটী ও অকল্যাণ, এবং বিজ্ঞান-সম্মত কোন্ উপায় দ্বারা তাহাদের প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে, সেইসব সূক্ষ্ম বিষয়ও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

বিপ্লবের পূর্ব্বে ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকের অনেক কথা কেবল আওড়াইয়া যাইত মাত্র, কিন্তু তাহাদের প্রয়োগ জানিত না। কিন্তু লেনিন ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রচলিত পুরাতন পাঠ্যপুস্তকসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া অভিনব প্রণালীতে পুস্তক রচনা করাইয়াছেন, সেই সকল পুস্তক উপদেশ ও দৃষ্টান্ত-সমন্বয়ে লিখিত হওয়ায় অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ছাত্ররা স্কুলের কেবল শিক্ষার্থীই নহে, স্কুল-পরিচালনায়ও তাহাদিগকে কিছু অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শৃঙ্খলা-রক্ষা কিংবা শাসন-কার্য্যে তাহারা এখন কর্তৃপক্ষকে অনেকাংশে সাহায্যও করিয়া থাকে।

অধ্যয়ন জিনিসটি ছাত্রদের কিরূপভাবে গ্রহণ করা উচিত— লেনিন তাহা অতি অল্পকথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ছাত্র-দিগকে বলিতেন, "First study, then study hard, then study still more and still harder." লেনিনের এই উপদেশটি আপাত দৃষ্টিতে অতি সাধারণ ও সরল মনে হইলেও উহা যে আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়

না। লেনিনের এই উপদেশ ছাত্রদের নিকট বেদ-বাক্যের ন্যায় শিরোধার্য্য হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাহারা জ্ঞানলাভের জন্য উত্তরোত্তর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৪০ সালে ৬১৯,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ছিল কলেজে; উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িত ২০,০০,০০০ জন; আর নিম্ন বিদ্যালয়ে ছিল তিন কোটী। ৭৫টি বিভিন্ন ভাষায় ইহাদিগকে শিক্ষাদান করা হইত। কিন্তু শিক্ষার প্রসার সেখানে ক্রমশঃই এত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ত্তমান সংখ্যার তুলনায় ১৯৪০ সালের সেই সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বয়োবৃদ্ধদের জন্যও নানাবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তজ্জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হইতে হয় না। কারণ, রাশিয়াতে কেবল বিদ্যালয়ই একমাত্র শিক্ষার কেন্দ্র নহে। শ্রমিক সঙ্ঘে এবং বিভিন্ন কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীতে কার্য্যভেদে নানারূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহার ফলে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ক্রমশঃই ব্যাপকতর ও দ্রুততর হইয়া সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাশিয়ার শিক্ষা যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন। সুতরাং সৈন্যদিগকেও কেবল সামরিক শিক্ষাদান করিয়াই রাশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ পরিতৃপ্ত থাকেন না। তাহাদিগকে রাজনৈতিক

শিক্ষাও দেওয়া হয়। সৈন্যদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেমন স্কুল, কলেজ ও রণদক্ষ অফিসার নিযুক্ত আছেন, সেইরূপ সামাজিক এবং রাজনৈতিক শিক্ষাদানের জন্যও রীতিমত সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। প্রত্যেকটি সৈন্যদলের সঙ্গে এইরূপ শিক্ষাদাতা (Political Commissar) নিযুক্ত রহিয়াছে।

এই শিক্ষাদান ও শিক্ষা-প্রচেষ্টার জন্য লালফৌজ আজ মার্জ্জিত রুচি ও সুশিক্ষিত হইয়া সৈনিক-জগতের গৌরব রূপে পরিচিত। রাশিয়ার যে সকল সৈন্য এখন কার্য্যবশতঃ পৃথিবীর অপরাপর দেশে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া লাল ফৌজের উৎকর্ষ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। আমাদের এই বাংলা দেশেও আমরা বিদেশী সৈন্য দেখিয়াছি। তাহাদের—বিশেষতঃ মার্কিন সৈন্যদের—আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, আমরা তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাহীনতারই পরিচয় পাই। লালফৌজ অধিকৃত দেশে বিজয়ীর মত অবস্থান করিতেছে না; তাহারা সেইসব দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক হিসাবেই সক্রিয় সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

জারের আমলে শিক্ষাকার্য্যে যে টাকা ব্যয় হইত, তাহার ১১ গুণ টাকা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ব্যয় করা হইয়াছে। এই ব্যয়ের পরিমাণ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। সদ্যোজাত শিশু হইতে

চারি বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত নার্সারী স্কুলে এবং চার হইতে সাত বৎসরের বালক-বালিকাদিগকে কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্তানের জননীগণ কাজে যাওয়ার সময় সন্তানদের প্রথমোক্ত স্কুলে রাখিয়া যান এবং ফিরিবার সময় বাড়ীতে লইয়া আসেন। আট হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। এইরূপ বয়সের প্রত্যেক বালক-বালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক (Compulsory) করার চেষ্টা হইতেছে। যুদ্ধের জন্য অবশ্য ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেছে সরকার। ইঞ্জিনিয়ারি, ডাক্তারী, যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক—সর্বপ্রকার শিক্ষার বিরাট ও ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় কোন দেশের আপামর-জনসাধারণ উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধে যোগদান করে না, কিন্তু রুশিয়ায় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শিক্ষার ব্যবস্থা ও আদর্শ রুশিয়াতে এতই মহান ও উচ্চ যে, চৌদ্দ ও তদূর্দ্ধ বয়সের ছেলে-মেয়েরাও সেই উচ্চ ও মহান আদর্শ এবং সর্ব্বোপরি মানবতার ঐতিহ্যকে নাৎসীবাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এইজন্য সোভিয়েট সরকারের লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ করিয়া আমাদের দেশের মত আমলাতন্ত্রের নেতৃত্বে "জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট" গঠন করিতে হয় নাই। জনসাধারণ নিজেরাই নিজ নিজ এলাকায় আত্মরক্ষা সমিতি (Defence Committee) গঠন করিয়া সরকার ও সরকার কর্ত্তৃক গঠিত

State Defence Committeeর সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিয়াছে।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সময় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরিক্ষান্তে কাহার কিরূপ শারীরিক ত্রুটি আছে, তাহা মাতাপিতাকে জানান হয় এবং প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে সাহায্য করা হয়। খাদ্যদ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া ও কিরূপ খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল তাহা বলিয়া দেওয়া হয়। এইজন্য সরকার প্রত্যেক শিক্ষায়তনে ডাক্তার নিয়োগ করিয়াছেন।

খেলাধূলা, যথা :-সন্তরণ, দাঁড় টানা, ডন, কুস্তি ও অন্যান্য আধুনিক খেলাধূলা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বালক-বালিকাকেই কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়া শরীর সবল করিতে হয়। সরকারী তত্ত্বাবধানে প্যারাস্যুট-লম্ফন, এরোপ্লেন পরি-চালনা প্রভৃতি ক্রীড়ার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ২০-২১ হাজার, এখন কেবল স্কুলের জন্যই ১৪০,০০০ ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। তাহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা বর্তমান জগতে উৎকৃষ্টতর বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে; চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহারা এত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, তাঁহারা দুর্ঘটনাজনিত অথবা হার্টফেল করা মৃত রোগীকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারে—অবশ্য বিলম্ব হইলে আর তাহা সম্ভব নয়।

রাশিয়াতে বিজ্ঞানের আদরই খুব বেশী। বিজ্ঞানের বিভিন্ন

শাখার জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ আছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য এইরূপ অর্থব্যয় আর কোন দেশে হয় কিনা সন্দেহ। কারণ রুশনায়কগণ গোড়াতেই বুঝিয়াছিলেন যে, রুশিয়ার মত বিরাট কৃষি ও খনি-প্রধান দেশকে উন্নত করিতে হইলে বিজ্ঞান ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই তাঁহারা কাজ সুরু করিয়াছিলেন Electrification of Russia এই নীতি প্রয়োগ করিয়া। ভূতত্ত্ব (Geology), পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়ন (Chemistry), ধাতুবিজ্ঞান (Matallurgy), জীববিজ্ঞান (Biology), ও কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতির উপরেই সোভিয়েট সরকারের বিশেষ দৃষ্টি। বিজ্ঞানের পুরাতন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যে তাল রাখিয়া চলা যাইবে না, তাহা স্ট্যালিন খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদ হইতে জানিতে পারি। 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic rays),—যাহা চারি ইঞ্চি পুরু ইস্পাতকে ভেদ করিতে সমর্থ, তাহাকে মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য আফগানিস্থানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পামীর পর্ব্বতের উপরে বিরাট ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার গবেষণা হইতেছে। সংবাদপত্রে ইহাও প্রকাশ যে, আণবিক বোমারতত্ত্ব রুশিয়ার বিজ্ঞানীরা নাকি বৃটেন ও আমেরিকার পূর্ব্বেই জানিত। আরও প্রকাশ এই বিষয়ে তাঁহাদের পরীক্ষা (Experiment) এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহা নাকি মার্কিনের আণবিক বোমার গর্ব্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে। মোটের

উপর, ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, রুশিয়া বিজ্ঞানে কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নয়। সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি করিয়াছে রাশিয়া কৃষিবিজ্ঞানে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। গাছ হইতে উৎপাদিত রবার পর্য্যাপ্ত নয় বলিয়া প্রথমতঃ আলু হইতে এলকোহল প্রস্তুত করিয়া কৃত্রিম রবার তৈরী করা হইত। কিন্তু আলু এত অপর্য্যাপ্ত নয়। কারণ আলু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাহা হইতে ভোড্‌কা (রুশিয়ার মদ) প্রস্তুত হয়। সুতরাং বীট হইতে এখন এলকোহল প্রস্তুত করা হইতেছে। রাশিয়াতে এই বীটের অভাব নাই। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এইভাবে অসাধ্য সাধন করিতেছেন। এখন তাহাদিগকে বিদেশ হইতে রবার আমদানী করিতে হয় না।

অন্যান্য দেশে সংবাদপত্র প্রকাশের পিছনে একটি অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়; দেশ-সেবা থাকে গৌণ উদ্দেশ্য। শুধু তাহাই নয়, কয়েকক্ষেত্রে জনমতকে সঠিক পথে পরিচালিত না করিয়া সংবাদপত্র সংকীর্ণ ধনিক স্বার্থ-সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে দেশসেবার ভেক গ্রহণ করে। কিন্তু রুশিয়ার জনসাধারণ দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া জ্ঞান-প্রসারের সাহায্য করে। বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের নানাপ্রকার তথ্য প্রচার করিয়া জনমতকে সর্ব্বদার জন্য সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু করিয়া রাখে। দেশকে অগ্রগামী করিতে হইলে প্রত্যেক নরনারীর যাবতীয় বিষয়ে অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং সেই জ্ঞান

দশের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিতে পারে একমাত্র সাময়িক পত্র। তাঁহারা যে নূতন সমাজ গড়িতেছে—সেই বিষয়ে সম্যক উপদেশ, নির্দ্দেশ ও উৎসাহ দানের আবশ্যকতা আছে কাজেই পত্রিকাগুলিকে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রুশিয়ার প্রত্যেকটি পত্রিকা অপরটির পরিপূরক। এমন একটি সহযোগিতা বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে বর্ত্তমান, যাহা ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে পরিলক্ষিত হয়না। শেষোক্ত দেশ সমূহে (আমাদের দেশেও) গণস্বার্থকে গৌণ করিয়া পত্রিকার স্বত্বাধিকারিগণ পারস্পরিক প্রতিযোগিতার নেশায়ই মশগুল থাকেন। ফলে; জাতিগঠনের কাজ নেপথ্যে চলিয়া গিয়া রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে জাতির নামে জাতীয়তাবাদের বজ্জাতি। এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের সুরে বলিয়াছেন, “জাতির নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া”। রুশিয়া তাহার প্রতিটি কাজে এমন একটি স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিযাছে, যাহার তুল্য দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখা যায় না।

রুশিয়ার কাগজে কাজের কথাই বেশী থাকে। অন্যান্য দেশের কাগজের মত তরল গল্প-গুজব দিয়া চিত্ত বিনোদনের জন্য কলম (Column) রিজার্ভ থাকেনা। মেয়েরা কীভাবে কৃষির কাজে সাহায্য করিতেছে, ফ্যাক্টরীতে কীভাবে কাজ চলিতেছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কী নূতন তথ্য আবিষ্কার হইল, দুনিয়ার হালচাল কী—এই ধরনের বিবরণই বেশী থাকে। জারের সময়ে

সমগ্র সাম্রাজ্যে ৮৫৯ খানি কাগজ প্রকাশিত হইত এবং তাহাদের গ্রাহক সংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ শিক্ষার হার ছিল তখন অত্যন্ত নিম্নে। কিন্তু এখন শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৮০০০ (হাজার) হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেতারের সাহায্যেও জ্ঞান ও বিভিন্ন সংবাদ রুশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচার করা হইতেছে। গড়ে হয়তো এক শত লোকে একখানা কাগজ পড়ে। কোন কোন কাগজের ২০ খানা কপিও ছাপা হয়। ৭০ টা মূল বেতার-কেন্দ্র আছে। ইহাদের সহিত হাজার হাজার গ্রাম্য বেতার সংযুক্ত আছে।

মোদ্দাকথা—সোভিয়েট রাষ্ট্র এমন একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, অচিরকাল মধ্যেই রুশিয়ার প্রত্যেকটি অধিবাসী আধুনিক নাগরিক মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে রুশিয়ার শতকরা ৯৫ জন লোকের অন্ধ আবেষ্টনীর ভিতর আধুনিক জ্ঞানের আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই—জ্ঞানের নির্মম হস্ত যাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া অদৃষ্টবাদী করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহারা সেই আলোর স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া বৃহত্তর জগতকে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, অদৃষ্টবাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আত্মশক্তি ও মর্যাদার সন্ধান পাইয়াছে। এক কথায়, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, মানুষই মানুষের ভাগ্য-বিধাতা—কোনরূপ অদৃশ্য হস্ত অদৃশ্য স্থান হইতে তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত

করেনা। আত্মশক্তি সম্বন্ধে এই চৈতন্যই রুশিয়ার সমস্ত উন্নতির মূল। যাহারা আত্মবিস্মৃত তাহারা হতভাগ্য। আমরা আত্ম-বিস্মৃত বলিয়াই সহস্র বৎসরের পরাধীনতায় অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছি এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের মারফৎ ইঙ্গ-ভারত ধনিক ষড়যন্ত্রকে স্বাধীনতা মনে করিয়া প্রেস ও প্লাটফর্ম কাঁপাইয়া তুলিতেছি।

ধর্ম্ম

কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাহাতে কোনরূপ ধর্ম্মের স্থান নাই—সমাজ গঠনে ভগবানের হাতকে একেবারেই অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমাজ-গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলে একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বরাবর সবল দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। এবং সেই প্রভুত্ব করার অন্যায় দাবীকে ভগবানের বিধানহিসাবে প্রচার ও প্রতিপন্ন করিয়া সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সমাজে আমরা নিত্য নিয়ত কী দেখি? মহাজন খাতককে শোষণ করিতেছে, ধনিক শ্রমিককে বঞ্চিত করিতেছে, জমিদার কৃষককে ঠকাইতেছে। এই পরগাছা শ্রেণী অপরের পারিশ্রমিকের অংশ গ্রহণ করিয়া বিনা পরিশ্রমে দিন গুজরান করিতেছে এবং বিনিময়ে ভগবানের আশিস্‌বাণী অভাগাদের শিরে বর্ষণ করিতেছে—এইরূপ আরও অনেক। সুতরাং এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা যদি ভগবানের বিরুদ্ধে

যাওয়ার সামিল হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়—সকলকেই রাতারাতি ভগবান-বিরোধী হইয়া পড়িতে হইবে। বস্তুতঃ, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নীতি-ধর্ম্ম বিকৃত বা ব্যাহত হইল কিনা—সামাজিক কল্যাণের নামে সমাজে অকল্যাণের ক্লেদাক্ত পটভূমি রচিত হইল কিনা, অভিযোগকারিগণ সেদিকে তাহাদের অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন না। ইহার কারণ কী? একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সেদিকে অভিযোগ করিবার মতো কিছুই নাই। নীতি-ধর্ম্ম কখনও বিরোধ কিংবা বিদ্বেষ-মূলক হইতে পারেনা; অকল্যাণকে আশ্রয় করিয়া এই ধর্ম্ম প্রবল হইতে পারেনা। এবং ভগবান বলিয়া যদি কিছু অদৃশ্য শক্তি থাকে, তিনিও নীতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া জাগতিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করেন না। সুতরাং যেখানে সামাজিক কল্যাণকে রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রধানতম স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেখানে উক্ত নীতিধর্ম্মকে নির্ব্বাসন দিতে হয় নাই—বরং উহাকেই সমস্ত কাজের মূল প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই," এই কথাটি আমাদেরই। কিন্তু আমরাই তাহার অমর্য্যাদা করি প্রতিদিনের প্রতিটি ব্যবহারে। আজ এই কথাটির প্রকৃত মূল্য দিয়া রুশিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, সে ভগবানের মঙ্গলময় রূপকেই সামগ্রিক ভাবে-সামাজিকভাবে গ্রহণ করিয়াছে; তাহাকে মুষ্টিমেয়র একচেটিয়া অধিকারে সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষুদ্র বা বীভৎস করে নাই। রুশিয়া ধর্ম্মকে এই চিরন্তন সত্যের আলোকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

ধর্ম্ম আজ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধ কারাকক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কল্যাণের সুধারসে সকলকে অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খৃষ্টধর্ম্মের যাজকগণ জার-তন্ত্রের সমর্থক ছিলেন এবং নিজেরাও নানা উপায়ে উহাদের অর্থ অপহরণ করিতেন। ধর্ম্ম ছিল জারের হাতে অত্যাচারের যন্ত্র-বিশেষ এবং ধর্ম্মযাজকগণ এই যন্ত্রের যন্ত্রীর কাজ করিতেন। আজ যদিও এই ব্যবস্থা লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত দেওয়া হয় নাই —শুধু মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজির মুখোস খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে পুরোহিতগণ জমি ভোগ করিতেন। এখন তাঁহারা যজমান ও শিষ্যগণের সাহায্যে অথবা অন্য কোন প্রকার কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এখন জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার ভার তাঁহাদের উপর নাই। এবং বিবাহাদিও রেজিষ্ট্রেশন দ্বারা সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর পর শব প্রোথিত করিবার সময়ও তাঁহাদের আর প্রয়োজন হয় না। সরকার জনসাধারণকে নিজেদের ভিতরে প্রার্থনা-সভার আয়োজন করিতে বারণ করেন না। এমন কি গীর্জ্জায়ও একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ব্বের মত ধর্ম্মযাজকগণ এখন আর পৃথক শ্রেণী নয়। সোভিয়েট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার সময় তাঁহারা বলশেভিকদের প্রাণপণে বাধা দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনেক দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা যেভাবে জন-

সাধারণকে বিপথে চালিত করিয়া অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই তুলনায় তাঁহাদের শাস্তি লঘুই হইয়াছে।

জনহিতৈষণাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এবং ইহাই নবযুগের নবধর্ম্ম। এইজন্য যথেষ্ট ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সাহস প্রয়োজন। এই ধর্ম্ম পালনে যে বীরত্ব বলশেভিক নেতৃবৃন্দ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোন ধর্ম্ম-প্রচারকের পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। বলশেভিক-গণ সমাজতন্ত্রবাদ অবলম্বন করিয়া যে ভাবে জনসাধারণের সেবা করিতেছেন তাহা ধর্ম্মানুশীলনেরই নামান্তর মাত্র। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ এবং আত্মসংযম কোন সন্ন্যাসীর অপেক্ষা কম নয়। তাঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত নিয়ম পালন করিয়া চলেন, তাহা যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ লোকের নিষ্ঠার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যাজকগণ কি ভাবে লোক ঠকাইতেন, কি ভাবে খৃষ্টধর্ম্মকে বিকৃত আকারে সরল ধর্ম্মভীরু জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন, এবং কিভাবে Relics বা সেণ্টদিগের (Saint) হাড়, কেশ ইত্যাদি দেখাইয়া পয়সা আদায় করিতেন সেই সব কুকীর্ত্তি মিউজিয়ম খুলিয়া এখন জনসাধারণকে বুঝানো হইতেছে। সভ্য দেশের কোন শিক্ষিত লোকই এই-ভাবে প্রবঞ্চিত হইতে চায় না। সুতরাং রুশিয়ার জনসাধারণও এইরূপ প্রবঞ্চিত হইতে অস্বীকার করিয়া বোধ হয় ভগবান-বিরোধী কিছু করে নাই। আমাদের দেশেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফলে আজকাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

রুশিয়ার



ইহা যতই ব্যাপক হইবে, ততই আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। নতুবা আমাদিগকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইবে।

রুশিয়াতে ধর্মের নামে অত্যাচার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল, তাই আজ তথায় তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। এবং এই প্রতিক্রিয়া কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল নাস্তিকতায় পরিণত না হইয়া বাস্তবধর্মী কর্মধারায় সংহত হইতেছে। অর্থাৎ রুশিয়াতে আজ মানবধর্ম্ম স্থাপনের বনিয়াদ প্রস্তুত করা হইতেছে।

৬

নারীর অবস্থা

সমাজের উন্নতি ও অবনতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে নারীর সামাজিক পদমর্য্যাদার উপর। ভারতের ঋষি বলিয়াছেন "যেখানে নারী সম্মান পাইয়া থাকেন, সেইখানে দেবতারা আনন্দ লাভ করেন।" বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই নারীর মর্য্যাদা সভ্যতার একটি মাপকাঠিরূপে গণ্য করা হয়। পশুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টতা নির্ণীত হয় পাশবিক বল অনুসারে—মানুষের মধ্যে হয় সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক গুণদ্বারা। মেয়েরা ধর্ম্মবিশ্বাসে, নীতি-জ্ঞানে ও নীতিপালনে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে ত্যাগের শক্তি অধিক, এবং ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যে তাঁহারা যেন সাক্ষাৎ হেমগিরি। শারীরিক বল কম থাকিলেও অন্তর্ব্বীর্য্যে তাঁহারা পুরুষের চেয়ে খুব ন্যূন নয়। ইহা ছাড়া সেবায় যেন একেবারেই লক্ষ্মী। এই বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সভ্য মানুষমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সমাজে তাহা স্বীকৃত হয় না। কথা ও কাজের এই স্ববিরোধিতাই নারীদিগকে সমাজদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। এবং পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ইহাকে

'দুর্নীতি' 'দুর্নীতি' বলিয়া কলঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে পুরুষের বিলাসের উপকরণে পরিণত করিয়াছে। শারীরিক শক্তির আধিক্য ও আর্থিক ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় পুরুষের পক্ষে ইহা সমাজে কায়েম করাও সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা চিরন্তন নয়, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারও রূপ বদলাইয়া যায়। সুতরাং কাল যাহা সত্য ও বাস্তব ছিল আজিকার প্রয়োজনে তাহাই মিথ্যা ও অবাস্তব বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সামাজিক প্রয়োজনে নূতনরূপ পরিগ্রহ করে। সভ্যতা তথা সমাজের অগ্রগতি এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। কাজেই মেয়েদের অবস্থা যে আবহমান কাল একভাবেই থাকিবে ইহা মনে করা বাতুলতা মাত্র। কারণ সামাজিক জীব হিসাবে তাহার অবস্থাও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। ইহাকে বাধা দিতে গেলে অনর্থের সৃষ্টি হইবেই।

সকলরকম শক্তি থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের পরের উপরে নির্ভর করিতে হয়। আমাদেরই সৃষ্ট এই সামাজিক পটভূমি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট লজ্জার বিষয়। কিন্তু স্বার্থ অন্ধ, পুরুষ তাহা স্বীকার না করিয়া 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' নীতি অব্যাহত রাখিয়া প্রকারান্তরে জান্তবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। আবার আমরাই আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়া বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা করি,—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না!" আমরাই পুঁথিপুস্তকে তাঁহাদের

গৃহলক্ষ্মী সম্বোধন করিয়া ও দেবীর আসনে বসাইয়া পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টাও করি—কিন্তু তাহাতেই কি আমাদের কার্য্য শেষ হইয়া গেল? নারীর অশ্রুজল কি পুরুষের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় নয়? ইহাই কি আমাদের পৌরুষকে ধিকৃত করিতে যথেষ্ট নয়? ইহার কোন জবাব আমাদের সমাজে নাই। কিন্তু অন্যত্র আছে। এবং সেই জবাব দিয়াছে রুশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং তাহার নারী দিয়াছে অপর দেশের সমাজকে।

রুশ নারী আজ যে শক্তি, সাহস ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে—তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুযোগ পাইলে নারীও পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। যাহারা নারীকে অবলা বলিয়া সমাজে পুরুষের পায়ের তলায় রাখিবার পক্ষপাতী তাহাদের সরব মুখ আজ নীরব হইয়াছে।

আমরা হয়তো নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে কুণ্ঠিত—হয়তো অনিচ্ছুক, হয়তো সমাজের পক্ষে ইহাকে ভালই মনে করিনা, কিন্তু যখন সেই ঋষি-বাক্য মনে করি যে "সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্" এবং "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্", তখন এই ভাবিয়া আনন্দ পাই যে, ঋষিবাক্য অন্ততঃ পৃথিবীর একটা বিরাট খণ্ডে বাস্তব রূপ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। কিন্তু "অমৃতস্য পুত্রাঃ" ভারতবাসী ভারতের নারীদিগকে অমৃতের বদলে শুধু গরলই পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। ফলে নিজেরাও অমৃতের সন্তান হইতে পারে নাই,

এবং সমস্ত ভারতবাসীকেও মৃতের সামিল করিয়া আত্মবিস্মৃতির অতল তলে সমাধিস্থ করিয়াছে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। নারী আমাদের অধীন হইয়াছে এবং আমরা বিদেশীর অধীন হইয়াছি। সুতরাং যে-ব্যবস্থা কালের বিচারে বাতিল হইয়া গিয়াছে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই। বরং যাহা আজিকার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম, সেইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিবার জন্যই আমাদের তৎপর হওয়া দরকার। সেজন্য অতীতকে যদি অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক হয়, তাহাতে ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না। কারণ মৃত অতীতের পরিবর্তে জীবন্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তো পাইতেছি। পাঠক হয়ত বলিবেন যে, স্বামীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করার মধ্যে নারী-জীবনের একটি মহত্ত্ব রহিয়াছে। মেয়েদের সেবা ও ত্যাগ ইহাদ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা যদি পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বার্থপর, প্রবঞ্চক ও কঠিন-হৃদয়া হইয়া উঠিবেন, এবং স্বভাব-সুলভ লালিত্য ও মাধুর্য হারাইয়া ফেলিবেন। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি গ্রাহ্য বলিয়া মনে হইলেও স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনার কারণ-সমূহ সমাজ-ব্যবস্থা হইতে দূর করিয়া দিলে তাহার সম্ভাবনা নাই; কেন না, সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ না থাকিলে এবং প্রতিযোগিতার উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিলে সে-সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

আজ নারীরা যেভাবে দেশের ও সমাজের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। এখন সকল দেশেই মেয়েরা পুরুষের একচেটিয়া কাজ ও অধিকারগুলি দখল করিতেছে এবং ক্রমশই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং যদি মেয়েরা পূর্ব্বের স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতা ও কমনীয়তা পরিহার করিয়া খানিকটা কঠিনই হইয়া উঠে, যুগধর্ম্মকে আমরা বাধা দিতে পারিবনা। সুতরাং আমাদেরও আজ মনে প্রাণে নূতন হইয়া এই নূতন যুগের আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে।

রুশিয়াতে বিবাহের বন্ধনে ও বিচ্ছেদে, সন্তান-পালনে ও রক্ষণে, শিক্ষায় ও অর্থোপার্জ্জনে এবং অন্যান্য নাগরিক অধিকারে নারী পুরুষের সমান সুবিধা ভোগ করে। কোন বিষয়েই নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ করা হয় না। যে কোন কাজ নারী ও পুরুষ উভয়েই করিতে পারে। আজ রুশিয়ার নারী গাড়োয়ান হইয়া গাড়ী চালাইতেছে, ক্যাপ্টেন হইয়া জাহাজ চালাইতেছে, বৈমানিক হইয়া বিমান চালাইতেছে, এমন কি পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধও করিয়াছে! রেলওয়ে, খনি, কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, আইনসভা, বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহারা পুরুষের পাশে কাজ করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এক কোটি দশলক্ষ নারী বিমানের কাজে নিযুক্ত ছিল; অনেকে জাহাজের নাবিকের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিল। রাজমিস্ত্রির কাজ করিয়াও বহু নারী অর্থোপার্জ্জন করিত। ডাক্তারদের ভিতর অর্দ্ধেক

ছিল নারী। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ ছিল নারী। জজ, ম্যাজিস্ট্রেটের কাজেও অনেকে নিযুক্ত ছিল। এক কোটির অধিক মেয়ে শ্রমিক-সংঘের সভ্য ছিল। বিপ্লবের অব্যবহিত পর হইতেই নারীকে সমস্ত অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতেই এরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়া এই উন্নতি আরও দ্রুত, আরও ব্যাপক হইয়াছে।

আইনের সাহায্যে যাহা করিবার তাহা করিয়া দিয়া লেনিন বলিয়াছিলেন, "এখন জনমত সমর্থন করিলেই আমাদের সব দৈন্য দূর হইয়া যাইবে"। লেনিনের কথাই সত্য হইয়াছে। জনমত শুধু সমর্থনই করে নাই, জনসাধারণ আইনের প্রতিটি অক্ষর কার্যে পরিণত করিয়া নিজেদের সকল রকম দৈন্য দূর করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে পারিবারিক জীবন ভাঙিয়া যায় নাই। বরং পারিবারিক সুখ শান্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উপার্জনক্ষম হওয়াতে কঠিন জীবনযাত্রা সহজ হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীই অধিকতর উপার্জনক্ষম এবং কর্মঠ। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, এবং ইহাতে অসুবিধাও কিছু হয় না। সন্তানের জন্য তো উভয়েরই সমান দায়িত্ব। বিবাহ-বন্ধন অবশ্য সবসময় স্থায়ী হয় না।

মেয়েদের এখন নানারূপ সাংসারিক কাজের বোঝা আর পূর্বের ন্যায় বহন করিতে হয়না। অনেক স্থলেই হোটেলে উচিত মূল্যে খাদ্য পাওয়া যায়। শিশুদের জন্য নার্সারী ও কিণ্ডার-

গার্টেন জননীদের কাজের পক্ষে খুব সহায়ক হইয়াছে। স্বাস্থ্য খারাপ হইলে সরকারী খরচে সরকারী স্বাস্থ্য-নিবাসে পূরা বেতনে বিশ্রাম ভোগ করিতে পারে। এই জন্য দেশের সর্ব্বত্র স্বাস্থ্য-নিবাস খোলা হইয়াছে। এই সুবিধা অবশ্য পুরুষেরও আছে। নারীরা সন্তান হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে মোট তিন মাস পূরা বেতনে ছুটী পায়। কার্য্যোপলক্ষে স্ত্রী অন্যত্র বদলী হইলে স্বামীকেও তথায় বদলী করিবার বন্দোবস্ত আছে। অনেক সময় স্বামীর ও স্ত্রীর আলাদা থাকিতে হয়। আমাদের দেশেও অনেক সময় স্ত্রীকে পিতামাতা অথবা শ্বশুর-শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া স্বামী বিদেশে চলিয়া যায়। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে।

রুশিয়াতে একটি বিষয়ে পুরুষ ও নারীর প্রভেদ আছে। চাকরীর মিয়াদ পুরুষের চাইতে নারীর কম। ইহা অবশ্য শারীরিক কারণেই করা হইয়াছে। আমাদের দেশে, এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতেও স্ত্রীর সম্মান স্বামীর সম্মানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু রুশিয়াতে নারীর সম্মান নির্ভর করে নারীর নিজ নিজ কৃতিত্বের উপর এবং নারীমাত্রেই পরিচিতও হয় নিজ নিজ নামে—অমুকের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হয় না। অনেক স্থলে স্ত্রী হয়তো স্বামী অপেক্ষা বড় কাজ করে, তাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পর কোনরূপ অপ্রীতি বা অসন্তোষ পোষণ করেনা; ইহাতে মেয়েদের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্ত্রী কাজ করে বলিয়া স্বামী অগৌরব

বোধ করেনা, বরং তাহারা কাজ করিতে না পারিলে অসুখী বোধ করে।

নারীর এই অবাধ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, ইহাতে স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক জীবন ঠিক থাকে কিনা। কেন থাকিবে না? সামাজিক শাসনে মানুষ সর্ব্বত্রই নীতি-পরায়ণ ও চরিত্রবান হয়। রুশিয়াতে সতীত্ব নাই একথা বলা যায় না। সেখানেও সামাজিক শাসন আছে। নরনারী পরস্পরকে ভালবাসিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহাদের ব্যক্তিত্ব হীন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পশুরই ব্যক্তিত্ব নাই। ব্যক্তিত্বদ্বারাই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। সুতরাং যেখানে ব্যক্তিত্ব অথবা ব্যক্তির স্বাধীনতাই সমস্ত কর্ম্মের মূল প্রেরণা, সেখানে সামাজিক জীবনে নীতিভ্রষ্টতার কথা উঠিতে পারেনা। ব্যক্তির স্বাধীনতা যত বেশী হইবে, ব্যক্তিত্ব তত মহান হইয়া আদর্শকে বাস্তব করিবে। শতদলের মত বিকশিত হইয়া তাহা সমস্ত ত্রুটি বিদূরিত করিবে এবং সমাজকে প্রকৃত সাম্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। রুশিয়া নারীকে তাহার প্রাপ্য সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়া সেই পথেই দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমাদেরও চলিতে হইবে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি

রাশিয়ার সমস্ত কৃতিত্বের মূলে তাহার "কম্যুনিষ্ট পার্টি"। বিপ্লবের পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল "সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি"। কিন্তু মতান্তর হওয়ায় লেনিন উক্ত দলের অধিকাংশ সভ্যকে লইয়া "বলশেভিক পার্টি" গঠন করেন। নাম ঐরূপ হইলেও 'কম্যুনিজম' বা সাম্যবাদই তাঁহাদের আদর্শ ছিল। বিপ্লবের পরে এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "কম্যুনিষ্ট পার্টী" হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা ৪৫ লক্ষ। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে দেশের লোকসংখ্যা ১০ কোটি এবং যাহারা এরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে—তাহাদের একমাত্র পার্টির সদস্যসংখ্যা মাত্র ৪৫ লক্ষ। এইখানে একটা কথা ভুলিলে চলিবেনা যে, ভারতীয় কংগ্রেসের মত চারি আনা দিয়া রসিদ নিলেই এই পার্টির সভ্য হওয়া যায় না। এই পার্টির সভ্য হইতে হইলে প্রচুর জ্ঞান, সংযম, সাধনা ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া আসিতে হয়—এক কথায়, সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ খাঁটী মানুষের পর্য্যায়ে আসিতে পারিলে তবেই এই

সভ্যপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিরূপে এই ধাপগুলি অতিক্রম করিতে হয় তাহা জানা দরকার।

কম্যুনিষ্ট পার্টী তাহাদের আদর্শকে একটি সাধনার বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। যে কোন লোককেই তাহারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত করে না। পার্টীর সভ্য হইতে হইলে প্রথমতঃ এই দলের তিন বা পাঁচ বৎসরের পুরাতন সভ্য দ্বারা মনোনীত হইতে হইবে। তারপর এক বৎসর কম্যুনিজমের স্কুলে শিক্ষাধীন থাকিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষক থাকেন দলের নেতৃবৃন্দ। জুরীর মত তাঁহারা বিচার করিবেন যে, প্রার্থীর বুর্জোয়া মনোভাব বা Class feeling প্রভৃতি পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি আছে কি না। যদি অধিকাংশ পরীক্ষক ভোটে অনুকূল মত প্রকাশ করেন তবেই তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া একখানি রক্তবর্ণ খাতা দেওয়া হয়। এইভাবে তাঁহার সভ্য হইবার পূর্ণ অধিকার হয়।

সদস্য হইবার পর তাঁহার সমগ্র শক্তি, বুদ্ধি ও সময় দলের কাজে ব্যয় করিতে হয়। যে কাজ করিতে বলা হইবে— সেই কাজ তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। যত কঠিনই সে কাজ হউক না কেন—নিজের প্রতি এতটুকু দৃক্পাত না করিয়া তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ছোট বড় যে-কোন কাজই করিতে হইবে। কেবল মতে কম্যুনিষ্ট হইলেই চলিবে না— কাজেও কম্যুনিষ্ট হইতে হইবে। এইসব কাজের দ্বারা তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইবে বটে, কিন্তু দেশের অন্যান্য

প্রগতিশীল কাজের দিকেও তাহার নজর দিতে হইবে, এবং আবশ্যক মত করিতেও হইবে। এক কথায়, সাম্যবাদের প্রচারক, সংগঠক ও সংস্থাপক হিসাবেই তাঁহার কাজ করিতে হইবে। তাহাকে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে দেখিতে হইবে, যাহাতে সাম্যবাদী আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট সরকার অব্যাহত থাকে এবং দিন দিন তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়া মানুষকে পূর্ণতার পথে পৌছাইয়া দিতে পারে।

মুসলমানগণ যেরূপ 'শহীদ' হওয়াকে পরম গর্ব্বের বিষয় বলিয়া মনে করে, রুশ কম্যুনিষ্ট সভ্যরাও সেরূপ 'কার্য্যনিপুণ' (Expert) বলিয়া পরিচিত হইবার মধ্যে একটি গর্ব্ব বোধ করে। এইজন্য তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য একটি চেষ্টা লক্ষিত হয়। দলে ভর্ত্তি হইবার প্রাক্কালে তাহাকে একবৎসর স্কুলে থাকিয়া যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়—তাহাই শিক্ষার শেষ নয়—বরং সেখানেই শিক্ষার আরম্ভ। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাহাকে পড়াশুনা করিতে হয়। কেহ স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া পার্টিতে যোগ দিয়াছে বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়—এবং সতর্ক নজরও রাখা হয় যাহাতে সে কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারে। এই বিষয়ে নিয়ম-কানুন অত্যন্ত কড়া। এখানে ক্ষমা কিংবা অন্য কোনরূপ দুর্ব্বলতার স্থান নাই।

কম্যুনিষ্টদের জীবন যাপন-প্রণালী সাদাসিদে হইতে হইবে।

কোনরূপ ভোগ-বিলাস বা পানদোষে তাহারা দোষী হইতে পারিবে না। নিজের বলিয়া কিছুই তাহার থাকিলে চলিবে না। পার্টির মতকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—এবং তাহাই প্রচার করিতে হইবে। সমবেত আলোচনার পর যে সিদ্ধান্ত হইবে—তাহাই কার্যে পরিণত করিতে হইবে। কার্য ও মত দুই বিষয়েই ঠিক চাই। বিপ্লবকে পুরাপুরি সার্থক করিতে হইলে এই পথে চলিতে হইবে।

এইরূপ কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাদের কাজ করিতে হয়। তবে কোন কোন বিষয়ে তাহারা সাধারণ নাগরিকের চাইতে কিছু বেশী সুবিধা ভোগ করে। কম্যুনিষ্ট দলের 'সভ্য' বা 'লেনিনের শিষ্য' বলিয়া তাহারা লোকের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র। লালখাতা খানি দেখাইলে অনেক বাড়ীর দরজা তাহাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়। কোন কোন উচ্চ পদেও তাহারা নিযুক্ত হয়। থাকিবার ও পড়িবার ভাল ব্যবস্থা, এমন কি মোটর পর্যান্ত সময় সময় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহারা পায়। সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাহাদের একটু খাতির করা হয়।

স্বর্গীয় রুজভেল্ট-সাহেব-প্রেরিত আমেরিকার রাজদূত ডাভিজ সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন "Human nature is functioning here", অর্থাৎ রুশ জনসাধারণ মানুষের মতই ব্যবহার করিতেছে—তাহারা দেবতা কি বা পশু হইয়া যায় নাই। কথাটি যে সত্য তাহা অন্য লেখকরাও বলিয়াছেন এবং বহু কাজের দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে এখন আর

ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হয়ত তার প্রয়োজন ছিল।

পরিশেষে একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এইরূপ নিষ্ঠা ও আদর্শ-সম্বলিত রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন আছে। লেনিনের মত নেতার আবির্ভাব ভারতে হইয়াছে কিনা জানিনা। কিন্তু না হইলেও অচিরেই যে হইবে তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ ভারতের রাজনীতি আজ Lucrative profession-এ পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ রাজনীতি এখানে সাধনা হিসাবে নয়—পেশা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, আদর্শভ্রষ্টতা, সর্ব্বোপরি ধনিক শ্রেণীর প্রভাব সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপে প্রতিফলিত হওয়ায় রাজনীতি এমন একটি স্তরে নামিয়া আসিয়াছে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ বৈপ্লবিক আদর্শ অব্যাহত রাখিয়া চলিবার অনুকূল আবহাওয়া নাই বলিলেই চলে। সুতরাং সুবিধাবাদ ও সংকীর্ণ স্বার্থবাদকে নির্মম আঘাত করিবার জন্য ভারতে একজন লেনিনের আবির্ভাবেরই আজ প্রয়োজন। যত শীঘ্র এই আবির্ভাব ঘটে ততই মঙ্গল। পলাশীর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে ক্লীবত্ব আমাদের জাতীয় জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছিল তাহা দূর করিয়াছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। আজ রাজনৈতিক দুর্নীতি দূর করিয়া আদর্শ-সমাজ গঠনের জন্য অনুরূপ আবির্ভাব না ঘটিলে আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রার অবসান যে কোথায় হইবে কে জানে?

জাতীয় সমস্যার সমাধান

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রুশিয়ার বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে মোটামুটি বলা হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে যে এই জটিল জাতীয় সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে, সেকথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ইহা ছাড়া, ভারতের মুক্তিকামী নর-নারীর এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা, এই জাতীয়-সমস্যা আজ ভারতবর্ষে 'হিন্দুস্থান,' 'পাকিস্থান,' 'দ্রাবিড়স্থান' প্রভৃতির আকারে এমনভাবে উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার আশু কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা না হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি পৃথক্ পরিচ্ছেদ হয়তো অবাঞ্ছনীয় হইবে না।

রাশিয়ার জাতিগুলি চিরদিনই অভাব-অনটনগ্রস্ত ছিল ইহার উপর জারের ভেদ ও উৎপীড়ন-নীতি ইহাদিগকে একেবারেই ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল। এইজন্য লেনিন জারের রুশিয়াকে বলিতেন—"বিভিন্ন জাতির কারাগার!"

"অক্টোবর বিপ্লবের" পূর্ব্বে শুধু রুশদেরই যা একটু কৌলীন্য ছিল। অন্য সমস্ত জাতির কোনরূপ মর্য্যাদাই ছিলনা। রুশদের ভিতরেও মাত্র মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণী সমগ্র সুখ-সুবিধা ভোগ করিত। বাকী শতকরা ৯০ জন কৃষক মজুরের কোনরূপ রাজনৈতিক অধিকার ছিলনা—ঘানির বলদের মত তাহারা শুধু উচ্চশ্রেণীর সুখ-সুবিধা সরবরাহ করিত। পুরোহিত, জমিদার, ব্যবসাদার, কলওয়ালা, মিলমালিক, সর্ব্বোপরি জার তাহাদের সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং এক জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার স্বৈরতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার আন্দোলন এইভাবে দমন করিয়া জার-গভর্মেণ্ট যে নির্ম্মম বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়া গিয়াছে—মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহা একটি দুরপনেয় কলঙ্ক।

সাধারণ সবল অজ্ঞ জাতিগুলি কিরূপ শোষিত হইত—তাহার একটি নমুনা দিতেছি। উত্তর রুশিয়াতে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসাদারেরা তথাকার জনসাধারণের নিকট হইতে একটি সুঁচের বদলে একটি হরিণ নিয়া আসিত। এক বোতল মদের সহিত দামী কোন জানোয়ারের চামড়া বিনিময় করিত। এইরূপ অসমান বিনিময়-ব্যবস্থা অত্যল্পকালের মধ্যেই যে মারাত্মক জীবন-মরণ সংগ্রামে পরিণত হয়, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সমগ্র জগতে উৎপাদনে রুশিয়ার স্থান

শস্য	...	প্রথম
কৃষিযন্ত্রপাতি	...	প্রথম
বিট চিনি	...	প্রথম
ট্রাক্টর	...	প্রথম
স্বর্ণ	...	দ্বিতীয়
খনিজ লৌহ	...	দ্বিতীয়
কলকব্জা	...	দ্বিতীয়
যানবাহনের মোটর গাড়ী	..	দ্বিতীয়
বিদ্যুৎ	...	তৃতীয়
ফসফেট (একরকম রাসায়নিক দ্রব্য)	...	তৃতীয়
ইস্পাৎ	...	তৃতীয়
কয়লা	...	চতুর্থ

"অক্টোবর বিপ্লবের" পূর্ব্বে শুধু রুশদেরই যা একটু কৌলীন্য ছিল। অন্য সমস্ত জাতির কোনরূপ মর্য্যাদাই ছিলনা। রুশদের ভিতরেও মাত্র মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণী সমগ্র সুখ-সুবিধা ভোগ করিত। বাকী শতকরা ৯০ জন কৃষক মজুরের কোনরূপ রাজনৈতিক অধিকার ছিলনা—ঘানির বলদের মত তাহারা শুধু উচ্চশ্রেণীর সুখ-সুবিধা সরবরাহ করিত। পুরোহিত, জমিদার, ব্যবসাদার, কলওয়ালা, মিলমালিক, সর্ব্বোপরি জার তাহাদের সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং এক জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার স্বৈরতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার আন্দোলন এইভাবে দমন করিয়া জার-গভর্মেণ্ট যে নির্ম্মম বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়া গিয়াছে—মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহা একটি দুরপনেয় কলঙ্ক।

সাধারণ সরল অজ্ঞ জাতিগুলি কিরূপ শোষিত হইত—তাহার একটি নমুনা দিতেছি। উত্তর রুশিয়াতে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসাদারেরা তথাকার জনসাধারণের নিকট হইতে একটি সূঁচের বদলে একটি হরিণ নিয়া আসিত। এক বোতল মদের সহিত দামী কোন জানোয়ারের চামড়া বিনিময় করিত। এইরূপ অসমান বিনিময়-ব্যবস্থা অত্যল্পকালের মধ্যেই যে মারাত্মক জীবন-মরণ সংগ্রামে পরিণত হয়, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কাষ্ঠ একত্র করিয়া জ্বালাইলে আগুনের তেজ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে।"

জাতি ও ধর্মে খণ্ডিত-বিভক্ত আমাদের দেশবাসী একথা ভাবিয়া দেখিবে কি ?

শিক্ষা, শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরাতন ও নবীন রুশিয়া *

	১৯১৩	১৯৪০
লোকসংখ্যা	১৩৯	১৯৩ মিলিয়ন
শ্রমিক ও চাকুরীজীবী	১১.২	৩০.৪ মিলিয়ন
জাতীয় আয়	২১	১২৫ বিলিয়ন রুবল্‌স্
ব্যয়-বরাদ্ধ	৬৬৭০ (১৯২৮)	১৭৩২৫৯ মিলিয়ন রুবল্‌স্
হাসপাতাল (Beds)	১৭৫	৮৪০ হাজার
প্রতিষ্ঠান (নারী ও শিশুদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য)	৯	৪৩৮৪ (১৯৩৭)
শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)	৭.৮	৩৫ মিলিয়ন
উচ্চ শিক্ষা	১১২	৬২০ হাজার
পুস্তক	৮৬	৭০১ মিলিয়ন
থিয়েটার	১৫৩	৮২৫

* 'U. S. S. R. Speaks For Itself' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

বৈদ্যুতিক শক্তি	১·৯	৩৯·৬ বিলিয়ন (K. W. hours) (১৯৩৮)
কয়লা	২৯	১৬৪·৬ মিলিয়ন টন
তৈল ও গ্যাস	৯·২	৩৪২ মিলিয়ন টন
ইস্পাত	৪২	১৮৪ মিলিয়ন টন
ট্রাক্টর	০	৫২৩ হাজার
শস্য	৮০১	১১৯৫ মিলিয়ন সেন্টনারস্
কাঁচা তুলা	৭·৪	২৫·১ মিলিয়ন সেন্টনারস্

সমগ্র জগতে উৎপাদনে রুশিয়ার স্থান

শস্য	...	প্রথম
কৃষিযন্ত্রপাতি	...	প্রথম
বিট চিনি	...	প্রথম
ট্র্যাক্টর	...	প্রথম
স্বর্ণ	...	দ্বিতীয়
খনিজ লৌহ	.	দ্বিতীয়
কলকব্জা	...	দ্বিতীয়
যানবাহনের মোটর গাড়ী	..	দ্বি ীয়
বিদ্যুৎ	...	তৃতীয়
ফস্‌ফেট্ (একরকম রাসায়নিক দ্রব্য)	...	তৃতীয়
ইস্পাৎ	...	তৃতীয়
কয়লা	...	চতুর্থ